বিচলিত সময়

প্রথম খণ্ড

বিচলিত সময়

আবদুন্ নূর

SUBARNA

বিচলিত সময় (প্রথম খণ্ড)
আবদুন্‌ নূর

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৫, ফাল্গুন ১৪১১

দ্বিতীয় প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১৪, পৌষ ১৪২১

প্রকাশক
আহমেদ মাহফুজুল হক
সুবর্ণ
বুকস্‌ এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, রুম নং ২৩৫
৩৮/৩ বাংলা বাজার। ঢাকা-১১০০
ফোন: ৭১২২৪১৬

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
গৌতম ঘোষ

©
লেখক

E-mail: anoor.cmidp@gmail.com

কম্পোজ ও মুদ্রণ
ভেকটোরাস
ফোন: ০১৫৫৩৫৪০৩৯৪

ISBN 978-984-91105-5-2

BICHOLITO SOMOY (First Part) by Abdun Noor. Published by Ahmed Mahfuzul Haque, SUBARNA, Books and Computer Complex, 38/3 Bangla Bazar. Dhaka-1100. Second Print December 2014. Compose and printed by VectoRas. Tel: 01553540394

মূল্য
৬০০ টাকা

US $40.00

আমার আত্মজ
ওয়ামীক নূর ও ওয়াসীম নূর

বাংলায় না জন্মেও তোমরা হয়েছো
বাংলার সত্য সন্তান। বাংলার মন-
মানস, জীবন ও তিতিক্ষা তোমাদের
ধ্রুব। তোমরা ও তোমাদের প্রজন্ম
হয়েছে একুশ শতকের বিশ্ব বাঙালির
প্রতীক। তোমরাই বহন করবে
আগামী সহস্রাব্দের বাঙালির পরিচয়,
হবে বাংলার প্রতিনিধি
মহান আল্লাহ'র মহিমায় কল্যাণময় ও
সুন্দর হোক তোমাদের জীবন

আব্বু
১৫ জানুয়ারি, ২০০৫

প্রাক-কথন

"বিচলিত সময়" উপন্যাস আমার বিস্ময়ের স্বাক্ষর। সতেরোশ' শতাব্দীর মেহনতী বাঙালি সমাজ স্বীকার করেনি বহিরাগত শাসকদের শোষণ, ওদের সৃষ্ট তথাকথিত আশরাফ-আতরাফের ব্যবধান। বাঙালি মনন দুর্জয় হয়েছে বাংলা ভাষার অধিকার রক্ষায়। বাঙালি সমাজ সহমর্মিতার মধ্য দিয়ে ঘুচিয়েছে মানুষে মানুষে ব্যবধান। অথচ বিচলিত সময় এ প্রাচ্য মিলেছে পাশ্চাত্যে। ভরা পূর্ণিমায় মুঘল নারী কালো নেকাবে মুখ ঢেকে বুড়িগঙ্গার পাড়ে বেরিয়েছে অভিসারে। পাশ্চাত্যের বণিককুল প্রেম ও বাণিজ্যের মোহে অবিরল দ্বন্দ্বে মত্ত থেকেছে।

ভাবতেই পারিনি সময়ের সিঁড়ি ধরে আমার চেনা অচেনা ঢাকা আমাকে নিয়ে যাবে অতীত বাংলার প্রাণবন্ত সেই ঐতিহ্যে। ভাবতেই পারিনি বন্ধু লেখক ও প্রাবন্ধিক ফখরুজ্জামান চৌধুরীর কাছ থেকে ধার নেয়া গ্রন্থ খুলে দেবে প্রাচ্য ঢাকার অজানা রহস্য। ভাবতেই পারিনি লালবাগের কেল্লা ও পরী বিবির কবরকে ঘিরে ছোট্ট একটি প্রেমের নাটক লেখার অঙ্গীকার অবশেষে পরিণতি নেবে বিশাল এক উপন্যাসে। ভাবতেই পারিনি উপন্যাসের প্রতি স্তরে অর্থনীতিবিদ হাসান ইমামের সূক্ষ্ম পর্যালোচনা উপন্যাসের অভাবিত গতি বৃদ্ধি ও বিন্যাস সাধন করবে। ভাবতেই পারিনি, আমার তারুণ্যের পায়ে পায়ে হেঁটে বেড়ানো পুরনো ঢাকার অলিগলি খাজে দেওয়ান, চকবাজার, সদরঘাট, মুকিম কাটারা, পিলখানা রূপ নেবে ইতিহাসের উজ্জ্বল প্রতীকী রূপে।

লিখতে সময় নিয়েছে দীর্ঘ পনেরো বছর। কখনো লেখনী চলেছে ধীরগতিতে। আবার কখনো সচল হয়েছে আশ্চর্য দ্রুততায়। আবার কখনো থমকে থেকেছে বছরের পর বছর। এই বিশাল সময়ের পরিসরে প্রথম পর্যায়ে সম্পাদনায় সম্পৃক্ত থেকেছে অধ্যাপক আহমেদ রেজা এবং শেষ পর্যায়ে আনোয়ার ফরিদী। গ্রাফিক শিল্পী আতিকুর রহমান পাঁচ বছর ধরে অবিচল আগ্রহ আর ধৈর্য্য নিয়ে উপন্যাসের সার্বিক তত্ত্বাবধান করেছে অত্যন্ত নিষ্ঠা আর একগ্রতার সাথে, যার কোনো তুলনা নেই। উপন্যাস লেখার বিবিধ পর্যায়ে তথ্য, উপদেশ, ও উৎসাহ দিয়েছেন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, কলামিস্ট আবদুল গাফফার চৌধুরী, কথাশিল্পী ফারুখ ফয়সাল, ছোট গল্পকার সাদ কামালী ও বাংলার বিরল মানচিত্র সংগ্রাহক রাসাদ চৌধুরী।

উপন্যাসের অনেক পরিসর জুড়ে রয়েছে অহম রাজকুমারী নাঙছেন গাভারু আর তার নিরন্তর সংগ্রামের কথা। লেখক ও চিন্তাবিদ অতুলানন্দ গোস্বামীর কাছ থেকে আমি পেয়েছি অহম দেশ ও সংস্কৃতির পরিচয় এবং অহম রাজকুমারী নাঙছেন গাভারুর অহম বুরুঞ্জীর রক্ষিত কথকতা। সম্পাদক হায়দার হুসেন আমাকে দিয়েছেন অহম ইতিহাস ও সমাজের অভিজ্ঞা। আমার জায়া-অগ্রজ সমাজবিদ নুরুন নবী ও জায়া-অনুজ ইফতিখার আহমেদের কাছে পেয়েছি অহম ভাষা ও সমাজ জীবনের নিষ্ঠ চিত্র এবং জায়া অগ্রজা জাহানারা চৌধুরীর কাছে পেয়েছি অহম পারিবারিক চিত্র।

লেখা আমার নেশা। সেই নেশার নিয়মিত খোরাক সময় ধার দিয়েছে জায়া নাজমা নূর।

ওদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। মহান আল্লাহ আমাদের সবার প্রয়াস সার্থক করুন।

আবদুন্ নূর
১৫ জানুয়ারি ২০০৫

তিব্বত
কোচবিহার
ধুবড়ি
শেরপুর
বিহার
সাতগাঁও
চন্দ্রদ্বীপ
উড়িষ্যা

ব্রহ্মপুত্র নদী
নামরুপ
দারাঙ্গ
খিলঝুড়ি ঘাট
গড়গাঁও
অহম রাজ্য
যোগীঝোপা
গুয়াহাটি
গোয়ালপাড়া
সুসাংগ
শ্রীহট্ট
ত্রিপুরা
নোয়াখালী
সন্দ্বীপ
সামানদার
পালংকী
মিয়ানমার

এই উপন্যাসের সমুদয় লভ্যাংশ আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতালের জন্য লেখক কর্তৃক অর্পিত।

সুবাহ বাংলার রাজধানী ঢাকা। হাজারো অলিগলির শহর। বুড়িগঙ্গাকে পাশে রেখে গড়ে উঠেছে। নদীপথেই বাণিজ্য বেশি। চলাচল হাজারো নৌকোর। সেকারণেই নদীর পাড়ে পাড়ে গড়ে উঠেছে গঞ্জ, বাজার। হয়েছে লোকজনের বসতি। ছোট কাটরা বড় কাটরাকে কেন্দ্র করেই শহর ঢাকা। বসতি হয়েছে নদীর পাশ দিয়ে লম্বা করে। বুড়িগঙ্গার পাশেই শহরের দক্ষিণে। মুঘলরা সেই শহরের নাম দিয়েছে জাহাঙ্গীরনগর।
সেপথেই ভরা পূর্ণিমা রাতে বেরুলো শাহজাদা মুহম্মদ আজম শাহ্। রাতের নগরীকে দেখার জন্য। সাথে মাত্র দু'জন বিশ্বস্ত সহচর। সাধারণ বেশভূষা পরেছে শাহজাদা। সহচররাও তেমনি। দেখলে মনে হবে ধনী রইস, ফুর্তি করতে বেরিয়েছে সহচর নিয়ে। ১৬৭৮ সাল।

লুকিয়ে পথে পথে হেঁটে বেড়ানোর এই বংশানুক্রমিক রেওয়াজটা দাদা, পরদাদার কাছ থেকেই পেয়েছে শাহজাদা। নিশীথ রাতে এভাবে আকবর গিয়েছে, জাহাঙ্গীর গিয়েছে। ওয়ালেদ আওরঙ্গজেব নিজেও যায়। রাতের অন্ধকারে ওরা বেরোয়। আজম শাহেরও ভালো লাগে এমনি গোপনে হাঁটতে। ইচ্ছে হলো অজানা পথচারীর সাথে কথা বললো। ইচ্ছে হলো সরাইখানায় বসে ওদের মুখরোচক খাবার খেলো। অথবা ইচ্ছে হলো শুধুই হাঁটলো।

হাঁটা আর হাঁটা। ছায়া-ছায়া মায়াঘেরা রাতে শুধু ধীরে হাঁটতে ভালো লাগে। খক্‌খকে কাশি, মৃদু গানের ইশারা, পথ দিয়ে ছলকে পড়া পথচারীর মৃদু হাসির ঝলক, মাঝে মাঝে চুড়ির ঈষৎ নিক্কণ, লজ্জায় সরে যাওয়া মেয়েদের ছায়া—এসব আকর্ষণ দেখে-দেখে শুধু এগিয়ে যাওয়া অধীর মাতালের মতো। প্রতি ভরা পূর্ণিমা রাতে শাহজাদাকে এমনি হাঁটার নেশায় পায়। ঘুরে ঘুরে কখন ওরা খিজিরপুরের ঘরে ফেরে, কেউ জানতে পারে না। অনেক রাতে এমনি অপেক্ষা করে করে অহমীয়া রাজকুমারী নাঙছেন গাভারু ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু মাঝরাতে ঘুম ভেঙে হয়তো দেখেছে শাহজাদা পাশে শুয়ে। কখন এসেছে নাঙছেন ঘুমের ঘোরে বুঝতেও পারেনি।
অবশ্য সব পূর্ণিমা রাতেই শাহজাদা বড় বেগম নাঙছেনের কাছে আসে না। মাঝে কখনো বা যায় মেজো বেগম জাহানজেবের কাছে। আবার কখনো ছোট বেগম ইরান দুখ্‌তের বাহুবন্ধনে। বড়ো বেগম নাঙছেন গাভারু একবার হিসেব রাখতে শুরু করেছিলো। রেখেওছিলো। দেখেছে, সে হিসেব পেলে মনে প্রশান্তি আসে না, দুঃখ আসে। অসহ্য যন্ত্রণা যেন সারা শরীরটাকে ঘিরে থাকে। মনের মাঝে একটা সূক্ষ্ম বেদনা গেঁথে থাকে। সেই থেকে গণনা করা ছেড়ে দিয়েছে গাভারু। এবং তার বদলে রেখেছে প্রত্যাশা। ভাগ্য ভালো হলেই শাহজাদা আসবে। অপেক্ষার আকাশ কখনো সীমাহীন হতে পারে না নাঙছেন গাভারুর। আজম শাহ আদর করে যার নাম রেখেছে রহমত বানু।
ঢাকায় আসার পর আমির ওমরাহরা শাহজাদাকে উপদেশ দিয়েছে একা রাত্তিরে বেরুনো ঠিক হবে না। শহরটা বিশেষ নিরাপদ নয়। বিদেশি বণিকরা নিয়মিত আসছে। ওদের মাঝে বেশিরভাগই মদ্যপ। এছাড়া সুদূর চট্টগ্রাম থেকে মাঝে মাঝে মগেরা ঢুঁ মারে আরাকান রাজের সহায়তায়। খুন খারাবি করে পালিয়ে যায়। অহমীয়ারা কম যায় না। মাত্র দু'যুগ আগেও ঢাকায় এসে তারা রাতারাতি রাশি-রাশি ক্রীতদাস বজরায় করে নিয়ে গেছে।

সুতরাং, কখন তাদের হামলায় পড়ে যাবে ঠিক নেই।
কিন্তু শাহজাদা আমির ওমরাহদের উপদেশ মানে নি। শাহজাদা ঢাকায় পৌঁছেছে ১৬৭৮ সালে। এসেই প্রথম ভরা পূর্ণিমাতেই বেরিয়েছে।
এবং কি আশ্চর্য, ছোট কাটরা পেরিয়ে আলী মিঞার ঘাট ছেড়ে আরো কিছুদূর আসতে না আসতে এক গায়কের উদাত্ত কণ্ঠ তাকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো টেনে নিয়ে এলো মুকিম কাটরার উপকণ্ঠে। বাদশাহি বাজারের কাছে। ছন বাঁশ কাঠ মিলিয়ে পরিচ্ছন্ন একটি ছোট বাড়ি– তার দাওয়ায় একটি যুবক গান গাইছে উদাত্তকণ্ঠে। ওর চারপাশ ঘিরে অনেক শ্রোতা। ছদ্মবেশী শাহজাদা পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। নিবিষ্ট মনে গান শুনলো। ছেলেটির গলা অপূর্ব। সে গান গাইছে বাংলায়। শাহজাদা পুরো অর্থ বুঝতে পারছে না। নানা বয়সের মানুষ ওকে ঘিরে রেখেছে। গান শুনছে। মাঝে-মাঝে ওর গলার সাথে শ্রোতারাও তাল মেলাচ্ছে। অবশেষে যুবকের গান থামলো। শাহজাদা গানের অর্থ জানতে চাইলে যুবক হাসলো।
"আপনি নিশ্চয়ই বিদেশি।"
শাহজাদা স্বীকার করলো।
"পরিচয় জানতে পারি কি আপনার?" যুবক বলে।
শাহজাদা উল্টো প্রশ্ন করলো।
"এ পথের ওপর দিয়ে কতো পথিকইতো যাওয়া আসা করছে। অনেকেই হয়তো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তোমার গান শুনছে। ওদের সবার পরিচয় কি তুমি জানতে চাও?"
যুবক স্বীকার করে।
"না। আমি জানতে চাই না। গান গাওয়া আমার শখ। আমার রুজি রোজগার নয়। সেই গান শুনে কোনো পথচারী তৃপ্ত হলে আমি সুখী। কোনো পথচারী অতৃপ্ত হলেও আমি অসুখী নই। সেজন্যই ওদের পরিচয় নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।"
"তবে আমার জন্য অন্য নিয়ম হবে কেন?" মৃদু হেসে প্রশ্ন করেছে ছদ্মবেশী শাহজাদা।
"সত্যিইতো।" কথা তোলে অন্য শ্রোতারা। "আমাদের সবাইকেই তুমি চেনো না। তবে কেন চিনতে চাইছো এই পরদেশি বিদেশিকে?"
"কারণ, কখনো কেউ আমার কাছে গানের অর্থ জানতে চায়নি। সে দেশি হোক, কি বিদেশি হোক।" গায়ক একটু বিরক্ত গলায় বলে—"আপনি নিশ্চয়ই বাবু। আল্লাহর অনুগ্রহ পেয়েছেন। বিদ্যাচর্চা করেছেন, জ্ঞানের অন্বেষণে বেরিয়েছেন। হয়তো বা আপনার জ্ঞানছত্রে বসে আমিও তৃপ্ত হতে পারবো। সেজন্যই জানতে চেয়েছি।" গায়ক মুখ ফিরিয়ে বিনীত কণ্ঠে শাহজাদাকে বলে।
"না, আমি জ্ঞানী নই। জ্ঞানের অন্বেষণেও আমি বেরোইনি। পারিনি। তবে আমি জ্ঞানীর সমঝদার। তোমার গলা শুনে মনে হলো যেন এক মুগ্ধতা জড়িয়ে রয়েছে। শ্রোতাকে সম্মোহিত করে। সেজন্যই জানতে চাইলাম এ গানের কী অর্থ।" শাহজাদা ওর মনের কথা বলে।
"শুনে আমি প্রীত হলাম।" গায়ক বলে—"আমার গাওয়া এই গান আমিই লিখেছি।"
"তবে তোমার গানের অর্থ বলো আমায়। আমি উপলব্ধি করতে চাই সেই মুগ্ধতা—যা তোমার শ্রোতাদের আঁকড়ে রেখেছে।"

“আমার গান একটি রূপসী নারীর জন্য।”
“হতেই হবে।” হাসে ছদ্মবেশী সুবেদার। “তুমি যুবক। রূপসী নারীর অর্চনা না হলেই আমি আশ্চর্য হতাম।”
গায়ক গানের অর্থ বয়ান করে।
“গানটি আমি তোমাকে ফার্সিতে বলতে পারবো না। তবে কথাগুলোর অর্থ করছি।”

“অনিন্দিতা সেই রূপসী নারী।
ওকে দেখে শরমে মুখ ঢাকে ভরা পূর্ণিমার চাঁদ।
লজ্জায় উর্ণি টানে রাণী সাগরে ফোটা পদ্মফুল।
ওর রূপের ডাকে উত্তাল হয়ে ওঠে বুড়িগঙ্গার রোমাঞ্চিত ঢেউ।
ওর হরিণ চোখ থেকে ঝরে পড়া অশ্রু
শরাবের মতো তপ্ত, বেহেস্তের মতো পবিত্র
সূর্যের রেখার মতো উজ্জ্বল।”

শাহজাদা শুনে হাতে তালি দিলো।
“মারহাবা। মারহাবা। তুমি কবি। তোমার কল্পনাশক্তি প্রখর। অতিকথন থাকবেই। কিন্তু প্রীত নিশ্চয়ই সেই নারী যাকে তুমি তোমার এই অনন্য রূপের অর্ঘ্য দিয়েছো, যার রূপের আরাধনা তুমি করছো।”
“আমার গানে অতিকথন নেই।” যুবক গায়ক হঠাৎ গর্জে ওঠে। “সে সত্যিই এক অসামান্যা নারী, এক আশ্চর্য রূপসী নারী।”
শুনে হো হো করে হেসে ওঠে সমবেত শ্রোতারা।
“কল্পনা করতে-করতে জাফর তুমি পাগল হয়ে গেছো।”
“আমি অস্বীকার করছি না।” হাসতে হাসতে বলে শাহজাদা। “তুমি নিশ্চয়ই সেই মেয়েটির প্রেমে পড়েছো। প্রেমিকের চোখে সামান্য নারীও অসামান্যা হয়ে ওঠে।”
“সে সামান্য নয় পথিক।” রুখে ওঠে জাফর। “সেই নারী অসামান্যা। আমার বর্ণনার সাথে সেই নারীর নিখুঁত মিল থাকবে না। থাকতে পারে না। কারণ আমার গানে আমি ওর রূপের সামান্য জ্যোতিকেও তুলে ধরতে পারিনি। আমার কবিতার চেয়েও সে নারী সুন্দরী।”
আবার হাল্কা হাসি জ্বলে ওঠে জনতার মাঝখানে। টিপ্পনী কাটে একজন।
“জাফর, তুমি নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছো, ঘরে বসে বসে খালি কবিতা লিখছো। তার চেয়ে বরং আমাদের সাথে ঘোরো, আনন্দ করো। চাঁদনী ঘাটে নতুন বজরা নেমেছে। শুনেছি দু’টি মিষ্টি আরাকানি মেয়ে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচের কসরৎ করছে দিনরাত। চলো দেখে আসি। হয়তো দেখবে তোমার রূপসী নারীর চেয়েও ওরা সুন্দরী। গালে ওদের পাকা ডালিমের রঙ। ডুবে যাওয়া সূর্যের সোনালি আভাও ওদের কাছে হার মানবে।”
হো হো হাসির দমকে যেন ফেটে পড়ে বাদশাহি বাজার। আরেকজন শ্রোতা টিপ্পনী কাটে।
“জাফরের সাথে থেকে-থেকে তুমিও কবি হয়ে উঠেছো। জাফরের সঙ্গদোষ বড় কড়া। আমরা সবাই হয়তো ওর সাথে থেকে ওর গান শুনলে কবি বনে যাবো। তার চেয়ে চলো

পালাই এখন। অনেক গান শোনা হয়েছে।"
শুনে জাফর রেগে ওঠে। চিৎকার করে বলে, "সরে যাও এখান থেকে। আমার গান আর শুনতে এসো না।"
রাগে একতারাটা তুলে নেয় জাফর। বগলে ঝুলিয়ে আলো-আঁধারি মাখা গলির মাঝ দিয়ে জোরে-জোরে হাঁটতে শুরু করে একরোখা রাগে। একবার শাহজাদার দিকে ফিরেও তাকায় না।
গান ভেঙে গেছে। শ্রোতারাও চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে।
শাহজাদা আজম শাহ্ নিঃশব্দে জাফরকে অনুসরণ করে। যুবকের মাঝে আকর্ষণ রয়েছে। দীপ্তি আছে। কথাবার্তার মাঝে কেমন যেন বেপরোয়া ভাব। যেন ইচ্ছে করলেই বিশ্বকে সে জয় করতে পারে। শুধু ইচ্ছেটা হলেই হলো।
চলতে-চলতে জাফর অনুভব করে সেই বিদেশি পথিক ওর পিছুপিছু আসছে। জাফরও থমকে যায়। থেমে পড়ে। শাহজাদা কাছে আসে।
"তুমি অল্পতেই রেগে যাও জাফর।"
"আমাকে নিয়ে কেউ ঠাট্টা করুক, সেটা আমার পছন্দ নয়।"
শাহজাদা প্রশ্ন করে, "তুমি কবি, স্পর্শকাতর হওয়া তোমার পক্ষে স্বাভাবিক। তবু বলবো, অতোটা স্পর্শকাতর হলে জীবনে চলতে পারবে? লোকের সাথে মানিয়ে চলতে পারবে?"
"আপনি কিন্তু আমাকে ভুল বুঝেছেন। আমি মিথ্যুক নই। ওরা ভেবেছে, আমি মিথ্যা বলেছি। সেজন্যই ওরা হেসেছে। হো হো করে হেসেছে।"
"আমি কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস করেছি।" শাহজাদা ধীরে বলে।
জাফর শুনে বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকে। থমকে গিয়ে শাহজাদার চোখে-চোখে তাকায়। দেখে এক আশ্চর্য বিশ্বাসী রূপ ওই বিদেশি পথিকের চোখে।
কথাটা বলে শাহজাদা চলতে শুরু করে। কিছুক্ষণ বিমূঢ় দাঁড়িয়ে থেকে জাফর ছুটতে ছুটতে শাহজাদার পিছু আসে। পিছু হাঁটতে হাঁটতে জাফর বলে, "আপনি চাইলে আমি কিন্তু প্রমাণ দিতে পারি।"
শাহজাদা তার কালো দাড়িতে হাত বুলোয়। মৃদু হাসে।
"আমিতো তোমায় বিশ্বাস করেছি। আমি তোমায় তা বলেছি। তুমি তো ফাঁসির আসামী নও যে প্রমাণ দিতে হবে। এসো, রাত্রি অনেক হয়েছে। ঘরে ফিরে যাও।"
শাহজাদা ফিরে হাঁটতে শুরু করে। বলে "হাঁটা আমার নেশা। এমনি হাঁটতে-হাঁটতে আবার হয়তো একদিন তোমার সাথে আমার দেখা হবে।"
শাহজাদা চলতে শুরু করে। জাফর তাঁর পিছু নেয়। প্রশ্ন করে, "আপনি কি একজন পুরুষ নন? আপনার কি কৌতূহল বলে কিছু নেই? একজন রূপসী নারীকে চাক্ষুষ দেখার কোনো ইচ্ছেই কি আপনার নেই?
"আছে, নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু বিদেশি আমি। আমি এদেশের আচারে অযথা হাত দিতে চাইনে।"
"তবে আসুন আমার সাথে। রাতের মধ্যযামিনী এখনো পার হয়নি। ওকে এখনো হয়তো পাওয়া যাবে ওর আরাধনায়। আসুন। সচক্ষে দেখবেন সেই রূপের নারীকে।"

“আরেকদিন হবে। আজ নয়। শহরটাকে চিনে নিই আজ। পরে এই শহরের নারীদের চিনবো।”

শাহজাদা মৃদু হেসে ধীর পায়ে ওর পথ চলা শুরু করে।

দুই

কী ভেবে যেন শাহজাদা আজম শাহ পরপর কয়েক সপ্তাহ জাহাঙ্গীরনগরের পথে বেরুলো। শুরু করলো ঘোরা। আলো আঁধারির মাঝে সাজানো-গোছানো ছোট-ছোট ঘর। বাঁশের বেড়া, খড়ের ছাউনি, মোটা চাটাইয়ের দেয়াল। মাঝে-মাঝে চোখে পড়ে পাতলা লাল ইটের বাংলো ধরনের ছোট ছোট ঘর। দিল্লির মতো দেয়াল ঘেরা। শাহজাদা বুঝতে পারে এসব বাড়ির মালিক হচ্ছে উঠতি ধনী পরিবার। ওদের টাকা হয়েছে। সম্পদ এসেছে।

ঢাকায় এখন বাণিজ্যের মৌসুম, ঘনঘটা। পর্তুগিজদের সাথে প্রতিযোগিতা করে ইংরেজরা বাণিজ্যে নেমেছে। বাণিজ্যের অধিকার পেতে। ফরাসিরাও পিছিয়ে নেই। ওৎ পেতে রয়েছে ওলন্দাজরাও। শাহজাদার দরবারে সবাই তদবির করতে এসেছে। সবাই বাণিজ্যের অধিকার চায়। সবাই চায় বাংলায় একচেটিয়া ব্যবসা করার অধিকার। তা নিয়ে ইউরোপীয় জাতগুলোর মাঝে চলছে রেষারেষি, আত্মকলহ। ভাবতেই হাসি পায় শাহজাদার। মুঘলরা না হয় মসনদের জন্য নিজেদের মাঝে কলহে মেতেছে। আর এরা মেতেছে অর্থের জন্য। কিন্তু দুটো জাতের মোহ কি এক নয়?

বড় কাটরার মুখে এসে থমকে দাঁড়ায় শাহজাদা। প্রাসাদে এখনো আলো জ্বলছে। ঘরে-ঘরে জ্বলে ওঠা আলোর মৃদু ছটা তিরতির করে কাঁপছে। বুড়িগঙ্গা থেকে মৃদু হাওয়া বয়ে আসছে। জাহাঙ্গীরনগরে এটাই সবচেয়ে বড় সুখ। দিল্লির দুঃসহ গরম এখানে নেই। সন্ধ্যা নামতে না নামতেই চর রঘুনাথপুর থেকে ছুটে আসা তীব্র হাওয়া বুড়িগঙ্গার পানি ছুঁয়ে নিয়ে আসে আশ্চর্য শীতলতা। মনের দাহকে তৃপ্তিতে সজীব করে তোলে। কখনো-কখনো হাওয়া দুর্বার হয়। প্রদীপের আভাকে দুরন্ত বালকের মতো হেসে খেলে যেন নিভিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। আজকেও তেমনি দামাল হাওয়া দিয়েছে। কিছুক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়ায় শাহজাদা।

বড় কাটরার প্রাসাদটি আজ যেন আলোয় ঝলমল করছে। আশ্চর্য রূপময় হয়ে উঠেছে। চাচা শাহ্ সুজা এটা নির্মাণ করেছিলো আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে। রুচি ছিলো সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহ্ সুজার। ঢাকায় এসে মনের মতো করে গড়েছিলো এই প্রাসাদ। এনেছিলো শ্বেতমর্মর, কৃষ্ণকালো মর্মর। সারা ভারত খুঁজে এনেছিলো সেরা কারিগর। পাঁচ হাজার মজুর দীর্ঘ চার বছর ধরে দিনরাত কাজ করে এ প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলো। অথচ চাচা শাহজাদা সুজা একটি রাত কাটালো না এ প্রাসাদে। যেদিন শেষ হলো, সেদিনই প্রাসাদটি দান করে দিলো গরীবের উদ্দেশ্যে সরাইখানা করে, মুসাফিরখানা করে। সাথে-সাথে লিখে দিলো কয়েকশত বিঘা জমি মুসাফিরখানা চালানোর জন্য।

পথিক আসে। থাকার কক্ষ পায় বিনামূল্যে। ইচ্ছে করলে মুসাফিরখানায় গিয়ে বিনামূল্যে খেতে পারে। কিংবা পথিকের খায়েশ থাকলে সরাইখানার নেয়ামাত খানায় গিয়ে মনের মতো খাবার কিনে খেতে পারে। বাবুর্চিটি বেশ ভালো। সাথে ঘি, সদ্যজবাই করা ভেড়া আর মটরশুটি মিলিয়ে সে এক আশ্চর্য স্বাদের বিরিয়ানি তৈরি করে। নেয়ামাত খানায় মাঝে-মাঝে দেয়া হয় শাহি দস্তরখানা। থাকে আকবরি মুরগি মুসল্লাম। চিকন চালের মাখনি

মুরগ। সম্রাট জাহাঙ্গীরের ভারি পছন্দ ছিলো। কখনো বা সবুজ শাক দিয়ে লাজিজ মুরগ শাক। পেঁয়াজ ও জাফরানি রং দিয়ে রকমারি রান্না। সাথে থাকে রুমালি রুটি। রোখনি নান। খাওয়া সেদিন নেয়ামাতখানায় ভালোই হয়।

শাহজাদা ভাবে সরাইখানায় একবার ঢুঁ মেরে দেখলে হতো খাওয়ার নতুন কোনো সুবাস পাওয়া যায় কিনা। পায়ে পায়ে এগুলো শাহজাদা আজম শাহ্। পাগড়িটা মাথায় ভালো করে জড়িয়ে নিলো। মুখের ওপর পাগড়ির আবরণ টানলো। সরাইখানায় এখনো অনেক লোক রয়েছে। এখনো অনেক আলো জ্বলজ্বল করছে। সাবধান না হলে ওর ছদ্মবেশ ধরা পড়ে যেতে পারে। এখানে অনেকেই বাংলার সুবেদারকে চেনে।

কয়েক পা হাঁটতেই চোখে পড়লো। সেদিনের সেই গায়ক যুবক জাফর হেঁটে যাচ্ছে। শাহজাদা কাছে এগিয়ে গেলো।

"কেমন আছো জাফর? আজ সন্ধ্যায় বাদশাহি বাজারের পাশ ঘেঁষেই এলাম। তোমায় সেখানে গান গাইতে দেখলাম না।"

জাফর আশ্চর্য হয়ে ফিরে তাকায়। চিনতে পেরে উচ্ছসিত হয়।

"ওহ্, দূরদেশি পথিক! এখনো ঢাকায় রয়েছো। আমিতো ভেবেছিলাম তুমি চলেই গেছো।"

"আমায় পথিক ডেকো না। আমার নাম রয়েছে। মুহম্মদ আজম।"

"নাম জেনে খুশি হলাম।" জাফর বলে। "কিন্তু এ শহরে সময় কাটিয়ে তোমার কোনো লাভ নেই। আমাদের এদেশ সহজ, সরল, অবারিত। এক পলকে চিনতে পারবে, এক লহমায় যা জানবে, হাজার লহমায় সেই জানাটাই বেঁচে থাকবে। এ এক উদাম হাওয়ায় আঁচল ছেড়ে দেয়া খোলা বেলাজ মেয়ে। আব্রু রাখতে জানে না। অপেক্ষা করেও নতুন কিছু জানতে পারবে না।"

জাফর হঠাৎ যেন দার্শনিক হয়ে ওঠে।

"তবু আমি জানতে চাই, দেখতে চাই।"

"সেটা তোমার ইচ্ছা।"

"জাফর, তুমি কি খুব পরিশ্রান্ত? তুমি কি খুব ক্ষুধার্ত?"

"না, আমি দুটোর কোনোটিই নই।"

"আমি কিন্তু খুব পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধার্ত।" শাহজাদা বলে। "সামনেই সরাইখানা রয়েছে। আমায় সঙ্গ দেবে?"

"মুসাফিরখানার উদ্বৃত্ত খাবার খাওয়ার রুচি আমার নেই। ওটা গরিবদের জন্য।" জাফর মুখ বেঁকিয়ে বলে। "আমি এখন ঘরে ফিরে যাবো। মা অপেক্ষা করছে।"

"কিন্তু জাফর, আমাকে তো খেতে হবে। আমার যে এখনো ঘরে ফেরার সময় হয়নি।" শাহজাদা ধীরে বলে। "অন্তত নেয়ামাতখানায় আমার সাথে বসো। এসো। আমার কাছে আশরফি রয়েছে। আমার মেহমান হবে তুমি।"

"না থাকলেই আশ্চর্য হতাম আমি।" জাফর হেসে বলে। "বেশ, তোমার আমন্ত্রণ আমি নিচ্ছি। কিন্তু বেশি দেরি আমরা করবো না।"

"তোমার মা কি জেগে থাকবেন?"

"মা আমার সব সময় জেগেই থাকে। আমি খাই আর না খাই। আমি আসি আর না আসি।

মায়েরা বোধহয় ছেলের জন্য রাতের বেলা জেগে থাকার জন্যই জন্ম নিয়েছে।” হাসে জাফর।

সরাইখানায় ঢুকে শেষ প্রান্তে স্বল্প আঁধার একটি জায়গা বেছে নেয় আজম শাহ্। গালিচার ওপর পাশাপাশি বসে। খাবারের আদেশ দেয়। বাদশাহি বাদাম পসন্দ। ভেড়ার কাবাব। নার্গিসি কোফতা। বাখরখানি কুলচা। আরো আনায় জাফরের জন্য মাছ ভাজা মাহ-ই বাইয়াব। সাথে মুরগ বিরিয়ানি আনারকলি।

“তোমার ওই রূপসী নারীকে আমি একবার দেখতে চাই।” বলে শাহজাদা।

জাফর বিস্ময়ে তাকায়। জাফরের নিজের সেই আশ্চর্য অনুরোধ সে যেন নিজেই ভুলে গেছে। বরং ক্ষেপে গিয়ে প্রায় রেগেই যেন বলে।

“কেন? প্রমাণ দেখতে চাইছো? মিথ্যা কবিতা লিখি কিনা জানতে চাইছো? লোকজন ডেকে ঘোষণা করতে চাইছো কবি সৈয়দ জাফর মিথ্যেবাদী?”

“তুমি আমায় আবার ভুল বুঝছো। আমি বাংলাকে চিনতে চাইছি বলেই তোমার সেই গানের রূপসী নারীকে দেখতে চাই। সে গানের মাঝে আমি যেন বাংলার একটা প্রতিচ্ছবি খুঁজে পেয়েছি।” আজম শাহ্ ওকে বোঝায়।

“কিন্তু ওকে দেখে কী হবে?” জাফর প্রশ্ন করে।

“জানবো সেই অনিন্দ্য রূপময়ীকে। তোমার গানে আমি যেন এক অনন্যা নারীর রূপ দেখতে পেলাম। পেলাম তোমার বাংলাকে। সেজন্যই আমি দেখতে চাই কে সেই অনন্যা নারী যে বাংলার রূপকে মূর্ত করে তুলেছে তোমার লেখনীতে, তোমার ভাষায়।”

“এটা আমার সযত্নে লুকিয়ে রাখা এক রত্ন। যদি কথা দাও তুমি কোনোদিন কোনো অপকার ওর জন্য বয়ে আনবে না, তবে আমি তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি সেই মেয়ের সাথে।”

“কথা দিলাম।” শাহজাদা ধীরে ধীরে বলে।

“তবে জলদি এসো।” জাফর হঠাৎ হাত ধরে টানে শাহজাদাকে। “রাতের মধ্যযামিনী গড়িয়ে যাওয়ার আগেই আমাদের পৌঁছতে হবে।”

“খাবারটা আসুক।” শাহজাদা অনুরোধ করে।

“অপেক্ষার সময় নেই পরদেশি। এসো।”

জাফর যেন আজমকে প্রায় টেনে নিয়েই চলতে শুরু করে।

তিন

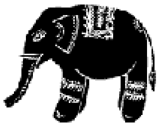

অন্ধকার পথ ধরে দ্রুত হেঁটে যায় জাফর।

"মধ্যযামিনী পেরোবার আগেই আমাদের পৌঁছতে হবে।" জাফর আবার তার কথার পুনরাবৃত্তি করে।

শাহজাদা ছুটতে-ছুটতে লক্ষ্য করে অনুচর দু'জন ওকে অনুসরণ করছে কিনা।

"আমরা যাবো নদীর ওপারে। ছোট কাটরার পরেই বাজার বসেছে। সেখানে নদীতে নামার জন্য ঘাট রয়েছে। ওখানেই নৌকো পাওয়া যাবে। সওয়ারি ঘাট সেখানেই চলো।" জাফর তাড়াতাড়ি হাঁটতে হাঁটতে বলে।

"কেন যাবে নদীর ওপারে?" শাহজাদা জানতে চায়।

"গেলেই বুঝতে পারবে। পায়ে চলতে তোমার কষ্ট হবে নাতো। পথ অনেকখানি। জিঞ্জিরার প্রাসাদ ওর কাছেই যাবো। গেলে রাতের ঝলোমলো জিঞ্জিরার প্রাসাদ দেখতে পাবে তুমি। যেতে চাও আজম? না, আজ থাকবে?"

"নিশ্চয়ই যাবো।"

সায় দেয় শাহজাদা। কিন্তু মনে-মনে শংকিত হয়। যেতে হবে নৌকোয়। কিন্তু ভয়টা মনের মাঝে গড়ে উঠতে না উঠতেই উড়িয়ে দেয় শাহজাদা আজম শাহ্। শংকা থাকলে বাংলার সুবেদারি করা তার পক্ষে চলবে না।

বুড়িগঙ্গার বাঁধের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওরা ততোক্ষণে ছোট কাটরার প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। রাত অনেক গভীর। প্রাসাদের জানালাগুলোর অনেক আলো এর মাঝেই নিভে গেছে। শাহজাদা ওপরে তাকিয়ে দেখে, ছোট বেগম পূর্বদিকের কক্ষে রয়েছে। সেখানেও বাতি নেভানো। নিশ্চয়ই সে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু এখনো জ্বলছে উত্তর পূর্ব কক্ষের আলো। মৃদু হাসি ফুটে ওঠে শাহজাদার ঠোঁটে। নাঙছেন গাভারু এখনো জেগে রয়েছে। একটু ভালো করে নিরিখ করে শাহজাদা। নিচে পথচারীদের ছায়া দেখে জানালা থেকে অবগুণ্ঠিতা অহমীয়া রাজকুমারী শরমে সরে গেলো। সত্যি শরমে সরে গেলো কি? একটি বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে শাহজাদার ঠোঁটে।

"দেখো, প্রাসাদে এখনো আলো জ্বলছে।" জাফর আজম শাহের দৃষ্টি টানে।

"নতুন মুঘল সুবেদার এসেছে। তার খায়েশ সারা রাত আলো জ্বালিয়ে রাখা। আগের সুবেদার শায়েস্তা খান কিন্তু কোনো অপচয় পছন্দ করতো না। রাতের প্রথম প্রহর পেরোতে না পেরোতেই প্রাসাদের প্রায় সব আলো নিভিয়ে দেয়া হতো। অথচ রোজ এক লাখ টাকা খরচ হতো তার দরবারে।"

"তুমিতো বেশ খবর রাখো জাফর।" শাহজাদা বলে। "অতো টাকা শায়েস্তা খান কিসে খরচ করতো?"

"কিসে খরচ হতো সেটা দরবারের লোকজন জানবে। আমরা শুনেছি দিনে তার কর থেকে আয় হতো দু'লাখ টাকা। এক লাখ টাকা যেতো দিল্লিতে। আর এক লাখ থাকতো শায়েস্তা

খাঁর প্রাসাদে। খরচ মেটাতে হতো সাতশ' নৌবহরের। এক লাখ তেত্রিশ হাজার সৈন্য মোতায়েন আছে ঢাকাতে। তাদের পোষণ করতে হতো শায়েস্তা খাঁকে।"

"তবে নতুন মুঘল সুবেদার কি শায়েস্তা খাঁর মতোই অমিতব্যয়ী?" শাহজাদা জানতে চায়।

"কি জানি? হতে পারে। সে সবে এসেছে মাত্র। মাস দেড়েক হবে। সময় নেবে জানতে। তবে সে হচ্ছে সম্রাটের নিজের ছেলে। শাহজাদা হয়তো একদিন দিল্লির বাদশাহ্ হয়ে যাবে। এমন তো প্রায়ই হচ্ছে। সম্রাট শাহজাহান হয়েছিলেন। নতুন সুবেদার এখনো নতুন কোনো প্রাসাদ বানাতে শুরু করেনি। শায়েস্তা খাঁর বানানো এই ছোট কাটরার প্রাসাদেই উঠেছে। তবে পয়লা কয়েক দিন নাকি বাবু বাজারের কাঠের প্রাসাদে ছিলো। শাহজাদার বিবিদের নাকি কাঠের ঘর পছন্দ হয় না।"

"নতুন প্রাসাদ কেন বানাতে হবে?" আজম শাহ্ জানতে চায়।

"তবে মুঘল সুবেদার হলো কেন! সে বাংলায় এসেছে পয়সা ওড়াতে। প্রাসাদ না বানালে ওর কীর্তি স্থায়ী হবে কেন? সুবেদারের কথা বাদ দাও। সামান্য নাওয়ারার দারোগা মুহম্মদ মুকীম। সেও কাটরা বানালো চুড়িহাট্টা মসজিদের কাছে। মুকীম কাটরা। প্রাসাদ হবেই। তবে শুনেছি বেশ মিশুক মানুষ নাকি এই নতুন শাহজাদা। রোজ সকালে ঈদগায় দরবারে বসে। ভাবছি একদিন গিয়ে দেখা করে আসবো। যাবে আমার সাথে?"

ভাবে শাহজাদা। নিজের পরিচয়টা দেবে কিনা। থাক এখন। একদিন প্রকাশ পাবে। বলে, "তুমি দেখা করলে মুঘল সুবেদার নিশ্চয়ই বিশেষ প্রীত হবেন।"

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে জাফর। ঘুটঘুটে অন্ধকার। চাঁদটা ঢলে পড়েছে। আলো প্রায় নেই।

"এটা সওয়ারি ঘাট। এখানেই আমরা নৌকো নেবো। তুমি অপেক্ষা করো। আমি মাঝির সাথে কথা বলে আসি।"

জাফর সিঁড়ি দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। সেই সুযোগে দেহরক্ষী দু'জন শাহজাদার কাছে এগিয়ে আসে। শাহজাদার কথা শুনে ওকে পাল্টা উপদেশ দেয় ওরা।

"আমিরুল মুলক্। নদীর ওপারে যাওয়া আপনার জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। এই কবি শত্রুপক্ষের চর হতে পারে। আমাদের অনুরোধ আপনি আপনার এই খায়েশ সংবরণ করুন।"

"বিপদের ঝুঁকি আমাকে নিতেই হবে। তোমরা বরং অন্য নৌকায় আমায় অনুসরণ করো।"

জাফর খুশিমনে ওপরে উঠে আসে।

"নৌকো পাওয়া গেছে। রাতের বেলায় সহজে কেউ বুড়িগঙ্গার ওপারে যেতে চায় না। বুড়িগঙ্গার স্রোত এখন বেশ কড়া। বড় বড় ঢেউ উজানে আসছে। নৌকো উল্টে যেতে পারে।"

জাফর হেসে আশ্বস্ত করে।

"নৌকো উল্টে পড়লে আমি কিন্তু ঠিক সামাল দিতে পারবো। তুমি সাঁতার কাটতে জানো পরদেশি?"

"না। আমি সাঁতার কাটতে পারি না।" মাথা নাড়ে শাহজাদা।

"তবে ভয় পেও না। আমি কাছেই থাকবো। নৌকো উল্টে গেলে শুধু আমাকে জড়িয়ে

ধোরো।"
প্রায় অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে সাবধানে নিচে নামে শাহজাদা। অবাক হয়। রাতের দ্বিতীয় প্রহর প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অথচ সওয়ারি ঘাটে যথেষ্ট লোকের সমাগম। লোকের চলাচল। পিদিম জ্বালিয়ে ছোট ছোট দোকান বসেছে। বিক্রি হচ্ছে খাবার। নানানতরো দেশি বিদেশি জিনিস, রঙবেরঙের চুলের ফিতে, ঘুঙুর। বিদেশি বণিকরা এসে বাজার ছেয়ে ফেলেছে। আরো আছে চিনির বানানো মিঠা মিষ্টি। লেবেঞ্চুস। চুষে খেতে হয়। গায়ের মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ছে এগুলো কেনার জন্য। বিলেতি মিষ্টির স্বাদ পেতে ওরা কাঁড়ি-কাঁড়ি কড়ি দিয়ে কেনে এগুলো।
একটি ছিপছিপে নৌকোয় ওরা চড়লো। ছই নেই। খোলা আকাশ। মাঝি একজন সবল যুবক।
"উজানে যেতে হবে আমাদের কবি। শক্ত করে বসো।" মাঝি হেসে বলে। "তুমি বরং নৌকোর গলুইতে চলে যাও। ভিনদেশিকে মাঝে বসতে দাও।"
"নৌকোটি যেন বেশি নড়াচড়া করছে মাঝি।" জাফর জানতে চায়।
"হাওয়া ছেড়েছে আজ। দিনটা সারাদিন গুমোট ছিলো। হয়তো ঝড় আসতে পারে।"
"ঢেউ যে ভীষণ উচ্ছৃংখল। বুড়িগঙ্গার এতো স্রোত, এতো বেগ আমি কখনো দেখিনি।" জাফর অবাক হয়ে বলে।
"তোমার কথায় মনে হচ্ছে বেশ ক'দিন নদী পার হওনি তুমি জাফর।"
"শুনেছি উত্তরের পাহাড়ে নাকি ভীষণ বর্ষা নেমেছে। গেলো পূর্ণিমার রাত থেকে নদীতে ঢল নেমেছে। ক্রমে পানি বাড়ছে। বন্যা না এসে যায়।"
"আসতে পারে।" মাঝি চিন্তিত স্বরে বলে– "কিন্তু পানি বেশি জোরে বাড়ছে না। তরতর করে উঠছে না। বৃষ্টির পানিটা নেমে গেলে বন্যা নাও হতে পারে। দু'চার দিনের মাঝেই বুঝতে পারবো।"
শাহজাদা ওদের কথায় কান দেয় না। সে মুগ্ধ চোখে বাইরে তাকিয়ে দেখে। রাত্রির আকাশ উদার। নক্ষত্র এখনো মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে। তবে পশ্চিমের আকাশে আলো নেই। হয়তো সেখানে মেঘ জমেছে। এখন নদীতে ভাসছে অসংখ্য নৌকো। কয়েক শ' তো হবেই। সবটাতেই আলো জ্বলছে। নিভু-নিভু প্রদীপের আলো। ঢেউয়ের তালে তালে নৌকোর আলোগুলো যেন নাচছে। শত শত আলোর ওঠানামায় আশ্চর্য রূপময়তা ছড়িয়ে পড়েছে বুড়িগঙ্গায়। রাতের আকাশকে সখা বানিয়ে কি এক উৎসবে যেন মেতেছে বুড়িগঙ্গা। সেই উৎসবে তাল মিলিয়েছে হাজারো মাঝি। উদাত্ত গানের কণ্ঠ। ভাটিয়ালী গান।
হঠাৎ বিজলী চমকালো। চরাচর চমকে উঠলো। খান্‌খান্ হয়ে যেন ভেঙে পড়লো সেই অপার্থিব আওয়াজ। ক্ষণিকের জন্য যেন শাহজাদা দেখতে পেলো ছোট কাটরার প্রাসাদ। নাঙছেন গাভারু কি ভয় পেয়েছে? বিছানার পাশে থাকলে ভয়ে সে হয়তো শাহজাদাকে জড়িয়ে ধরতো। সত্যি কি রাজকুমারী ভীষণ ভীতু? না কপটতার আশ্রয় নিয়ে চাইতো শাহজাদার আরো কাছে আঁকড়ে থাকতে?
"এসো আজম। আমাদের এখুনি নামতে হবে।" জাফর কাছে এসে বলে।
শাহজাদা নদী তীরে নামে। মাঝির দিকে ফিরে তাকায় জাফর।

"অপেক্ষা করো মাঝি। আমরা অল্প সময় পরেই ফিরে আসবো।"
শাহজাদা তাকায়। নদীর এপারে এই প্রথম এলো সে। তাও আবার রাতে। দূরে জিঞ্জিরার প্রাসাদ থেকে গানের রেশ ভেসে আসছে। জলসা চলছে। ইরানি এক নর্তকী এসেছে। আমির বদরুদ্দিন বহুবার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। যেতে হবে একবার। শুনেছে শাহ্ সুজার বানানো এ প্রাসাদটিও নাকি ভারি সুন্দর। জলসা ঘর নাকি আরো মনোহর। সেখানে ইরানি নর্তকীর নৃত্য নিশ্চয়ই আকর্ষণীয় হবে।
"সাবধানে চলো আজম। সামনে জঙ্গল রয়েছে। উঁচু উঁচু ঘাসের বেড়া ছাড়িয়ে বন্য জন্তুরা আসে নদীর পাড়ে পানি খেতে। খানাখন্দও আছে।"
"বাঘ আছে নাকি?" সভয়ে শাহজাদা জানতে চায়।
"আমি এখনো দেখিনি। তবে আছে। শাহবাগের জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। কবরখানা ওদের ভারি পছন্দ। তবে কেউ কেউ বলে জিঞ্জিরায় প্রাসাদেও বাঘ আছে। ওদের সাহসও কম নয়। নৌকো থেকে ঘুমন্ত মানুষকে ওরা মুখে তুলে নিয়ে যায়।"
"তুমি ভয় পাওনা জাফর?"
"যেদিন আমার মরণ আসবে সেদিন আসবেই। কেউ আমাকে রুখতে পারবে না।" জাফর হাসে, "সেজন্য বাঘ ভালুক নিয়ে আমি ভয় পাই না। তবে তোমার তলোয়ারটা হাতের কাছে রেখো আজম। বাঘ এলে লাফিয়ে পড়ো।"
তলোয়ার বের করতে হলো না। ওরা এসেই পড়লো। জাফর ফিসফিসিয়ে বলে।
"এটা একটা মন্দির। শিবের পূজা হয় এখানে। আমরা এখানেই এসেছি।"
"আমি কোনো মূর্তিকে উপাসনা করতে আসিনি।" শাহজাদা একটু রেগেই যেন ওঠে। মনে হয়, সে যেন বেশ হতাশ হয়েছে। "আমি পৌত্তলিক নই। আমি মুসলমান। আমি আল্লাহ্র রাহে বিশ্বাসী।"
"শব্দ করো না। বুঝতে পারলে ও চমকে যাবে, পালাবে। ভীত ত্রস্তা হরিণীর মতো লুকিয়ে থাকবে।" জাফর আবার ফিসফিসিয়ে বলে।
"কে সে?" এবার অবাক হয়ে শাহজাদা জানতে চায়।
"সিঁড়ি বেয়ে পায়ে পায়ে ওপরে উঠে এসো। উঠলেই বুঝতে পারবে।"
জাফর আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে সময়টা নিরিখ করার চেষ্টা করে। মাঝখান থেকে অনেকখানি হেলে পড়েছে। বলে, "না, এখনো সময় পার হয়নি। এখনো ওকে আমরা ওখানেই পাবো।"
পায়ে পায়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যায় দু'জন। মন্দিরের দরজা খোলা। শিবের মূর্তি উন্মুক্ত। স্বল্প আলোয় শিব দেবতা স্মিত হাসছে নৃত্যরতা এক নারীকে দেখে। ওর সামনে একজন রূপসী নারী আপন মনেই নেচে চলেছে।
জাফর ফিসফিসিয়ে বলে।
"ওই হচ্ছে রশমী। দেবতার কাছে ও নিজেকে আত্মদান করেছে। প্রতি রাতে ও দেবতার তৃপ্তির জন্য নাচে।"
মিথ্যে বলেনি জাফর। অপূর্ব রূপসী এই নারী। নিপুণ তার নাচের মুদ্রা। অপূর্ব তার দেহবল্লরী। ওর চোখে যেন বিশ্বের মুগ্ধতা। হাসিতে যেন অঘ্রাণের নম্র শিশির।

"ও আল্লাহ্‌র এক অপরূপ নিশানা। ওর সব রূপের জন্য প্রশংসা শুধু আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য।" মুগ্ধ শাহ্‌জাদা ধীরে ধীরে নিজেকেই শুনিয়ে যেন বলে।

চার

মুগ্ধ মৌনতায় শাহজাদা আজম শাহ্ রশমীর রূপে যেন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। নারী যে এতো রূপবতী হতে পারে, সেটা শাহজাদার কল্পনার বাইরে। সাতাশ বছরের তরুণ জীবনে অনেক নারীই সে দেখেছে। রাজ্যের পর রাজ্য বিজিত হয়েছে। উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে পশ্চিমে। নারীর পর নারী এসেছে মুঘল হারেমে। কেউ অতিথি হয়ে, কেউ ক্রীতদাসীর জীবন নিয়ে। কেউ ধর্মান্তরিত হয়ে। কেউ কবি, কেউ শিল্পী, কেউ নর্তকী। নানা দেশ, নানা সংস্কৃতি তাদের, নানা তাদের রূপের আধার। কেউ ভোরের শিশিরের মতো নম্র, কেউ দুপুরের সূর্যরেখার মতো প্রখর। আবার কেউবা রাতের মিটিমিটি জ্বলা নক্ষত্রের মতো দীপান্বিতা। মুঘল হারেমে নারীর অভাব নেই। শাহজাদা ওদের সংস্পর্শে এসেছে। কাছ থেকে দেখেছে, দূর থেকে চিনেছে। কেউ অল্প আহ্বানেই সাড়া দিয়েছে, কেউবা দীর্ঘ অনুসরণের পরও শাহজাদাকে ব্যর্থ করেছে, সাড়া দিতে অপারগ হয়েছে। কিন্তু শাহজাদা ওর জীবনে এমন অনন্য নারী আর কখনো দেখেনি। শ্যামল রঙ। যেন বাংলার কচি কলাপাতা। ডাগর গড়ন, ঠোঁটে মিষ্টি হাসি, চোখে যেন দূর বিদিশার নেশা জড়ানো। শ্যামল সবুজ প্রকৃতির আরেক রূপ যেন এই বিচিত্র নারী।

"রশমীকে তুমি কিভাবে চেন জাফর?" ফিরতে ফিরতে প্রশ্ন করে শাহজাদা।

"আমি ওকে এখানেই প্রথম দেখেছি শিব মন্দিরে। এক উদাস রাতে পথ চলতে চলতে হঠাৎ শুনি শিব মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে। নূপুরের ছন্দ প্রকৃতিকে যেন উজাড় করে ডাকছে। প্রদীপের মিটমিটে আলোয় আলোকিত হয়ে রয়েছে পূজামণ্ডপ। আমি ধীর পায়ে আসি। দেখি আপন মনে রশমী দেবতার সামনে নেচে চলেছে। ও নাচছেতো নাচছেই। ভোরের আলো দেবতার পায়ে আছড়ে না পড়া পর্যন্ত ও একমনে নেচেই চলবে। আমি একাগ্র হয়ে দেখেছি। ভোরের সূর্য না ওঠা পর্যন্ত।"

"কেন নাচে? মেয়েটার কোনো ইচ্ছে আছে? ওর দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে?"

"প্রার্থনাই ওর জীবন আজম।" জাফর গলায় কিছুটা বেদনা এনে বলে। "দেবতার কাছে ও জীবনকে উৎসর্গ করেছে। সে দেবদাসী।"

শাহজাদা আশ্চর্য হয়ে ফিরে তাকায়।

"দেবদাসী! আমি জানি সে প্রথা রয়েছে দক্ষিণ ভারতে। কুমারী মেয়েদের উপহার দেয়া হয় দেবতার মন্দিরে। ওদের সারাটা জীবন কাটে মন্দিরের দেবদেবী ও পুরোহিতদের সেবা করে। কিন্তু আমিতো এখনো শুনিনি বাংলায় এখনো এ প্রথা রয়েছে।"

"প্রথা কি কখনো মিলিয়ে যায় আজম? এখানেও কি সনাতনী ধর্ম নেই? কুলীন, অকুলীন জাতের প্রশ্ন এখানেও অহরহ ওঠে। কুলীন স্বামীর জন্য এখানকার অনূঢ়া মেয়েরা অপেক্ষা করে বছরের পর বছর। কুলীন ব্রাহ্মণ জামাই ধরে আনার জন্য মেয়ের বাবাকে এখনো দিতে হয় হাজার হাজার তংকা। দেশ বদলায়, স্থান বদলায়, ধর্মের রীতি কিছু বদলায় না আজম। সামনের মুখোশ হয়তো কিছু পাল্টে যায়, কিন্তু ভেতরের ভিত থাকে অটুট, নির্ভেজাল।" জাফরের কথায় বিচিত্র এক খেদ মেশানো।

"আমি ভেবেছিলাম বাংলায় হিন্দু ধর্মের অনেক পরিবর্তন এসেছে। পাল রাজাদের পর বৌদ্ধরা এসেছে। ওরা সাথে এনেছে বুদ্ধের উদাত্ত আহবান, জ্ঞান ও জীবন। জীবন ও জ্ঞান। বাংলার জীবনে অনেক নতুন রীতিনীতি এনেছে।"

"হ্যাঁ। বুদ্ধের বার্তা এককালে বাংলায় এসেছিলো। অনেকে নতুনত্বে মুগ্ধ হয়ে গ্রহণ করেছে। তারপর আবার যখন পুরনো সংস্কারের বাধা চাড়া দিয়ে উঠেছে তখন সবাই যেন হুটোপুটি খেয়ে সেই বাঁধনেই ফিরে গেছে। চারদিক তাকিয়ে দেখ না আজম। দেখবে বেশিরভাগ হচ্ছে হিন্দু পরিবার। পাশাপাশি রয়েছে ধর্মান্তরিত মুসলমান। এবং সবচেয়ে কম হচ্ছে বৌদ্ধ। শুধু বৌদ্ধমঠের চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে বৌদ্ধরা। ওদের চেয়ে সংখ্যায় হয়তো বেশি হবে গুরু নানকের শিষ্যরা।"

"বৌদ্ধরা বাংলায় এতো কম আমার বিশ্বাস হয় না।"

"ওরা ভোরের কুয়াশার মতো মিলিয়ে গেছে। দেশের লোক সবাইকে কি গণনা করা যায়, না কখনো করা গেছে? যদি গণনা করা যেতো, তবে আমার কথাই প্রমাণিত হতো। আমাদের বাড়ির ওপাশেই, মীর জুমলা দরওয়াজার কাছে, গুরু নানকের একটা মঠ রয়েছে। নিয়ে যাবো তোমাকে সেখানে আজম। দেখবে শত শত শিষ্য। অত শিষ্য তুমি কোনো বৌদ্ধ মঠে খুঁজে পাবে না।"

শাহজাদা চিন্তিত স্বরে বলে, "হয়তো বৌদ্ধরা জাহাঙ্গীরনগরে নেই। দেশের মঠে মঠে নিশ্চয়ই তাদের অনুগত শিষ্যরা রয়েছে।"

জাফর ভাবতে ভাবতে বলে।

"কথাটা হয়তো ঠিকই বলেছো। আমার ইচ্ছে আছে এর মাঝে একবার সোনারগাঁওয়ে যাবো। যাবো রামপালে। কতোই বা দূর হবে। মাত্র কুড়ি বা বাইশ ক্রোশ। কিছুটা পথ পায়ে হেঁটে, কিছুটা পথ নৌকায়। ধলেশ্বরীর উজান বেয়ে। গুনবো তখন পথের মাঝে কতোগুলো মন্দির, কতোগুলো মসজিদ, কতোগুলো বৌদ্ধ মঠ। পারলে ফিরিঙ্গি বাজার ঘুরে আসবো।"

শাহজাদা সায় দেয়, "বুদ্ধিটা তোমার ভালো। ছোটখাট একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। তবে হয়তো জাহাঙ্গীরনগরের আশেপাশে মসজিদই বেশি পাবে। শত-শত বছর ধরে মুসলমানরা এদেশে এসেছে। আল্লাহ্‌র মহিমা এবং ক্ষমতার নিদর্শন দুটোই দেখানোর জন্য হয়তো শুধু মসজিদ বানিয়েছে।"

"সেটা ঠিক আজম। আফগান রাজারা এসেছে। প্রত্যেকে একটি করে মসজিদ বানিয়েছে। মুঘল সুবেদাররা এসেছে। ওরা কিন্তু উঠে-পড়ে মসজিদ বানায়নি। সুবেদার ইসলাম খাঁ বানিয়েছে ইসলামপুরের মসজিদ। শাহ্ সুজাও পিছিয়ে নেই। তার সময়ে হলো চুড়িহাট্টার মসজিদ। সুবেদার শায়েস্তা খান বানিয়েছে বাদশাহি বাজার মসজিদ। মিরপুরের কাছে সাত গম্বুজ মসজিদ। পাশেই দারা বেগমের কবর। আলাকুরি মসজিদ।"

"মুঘল সুবেদাররা হয়তো মসজিদ দিয়ে জাহাঙ্গীরনগরে ওদের ক্ষমতাকে জাহির করতে চায়নি।" শাহজাদা ওর মত জানায়।

"তুমি বারবার এ শহরকে জাহাঙ্গীরনগর, জাহাঙ্গীরনগর বলছো কেন? আমাদের শহরটাকে নিজ নামে ডাকতে পারো না? এ শহরের নাম হচ্ছে ঢাকা।" জাফর হঠাৎ ক্ষেপে যায়।

"কিন্তু সুবেদার ইব্রাহিম খান নাম রেখেছে জাহাঙ্গীরনগর।" কিছুটা বিব্রত হয়ে বলে আজম শাহ্। জাফরের প্রশ্নটি এমন আচমকা এসেছে যে কি উত্তর দেবে বুঝতে পারছে না।
"সুদূর পারস্য থেকে সুবেদার ইসলাম খাঁ বাংলায় নিয়ে এসেছে গোলাপ। বড় সুন্দর ফুল। দেখো গিয়ে বড় কাটরার সরাইখানার মাঝে সুন্দর হয়ে ফুটে আছে। সে ফুলকে আমি যদি ডাকি দোলনচাঁপা তবে কি সুবেদার খুশি হবে? বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে তুষ্ট করতে গিয়ে উনি ঢাকার নাম রেখেছে জাহাঙ্গীরনগর। আমরা কি সেজন্য ওর ওপর খুব প্রসন্ন থাকবো? আমরা আমাদের শহরকে ডাকবো আমাদেরই অনেক চেনা নামে।"
"সেটা আমিও লক্ষ্য করেছি। সরকারি দলিল-দস্তাবেজ ছাড়া আর কোথাও জাহাঙ্গীরনগরের নাম লেখাও নেই। অথচ প্রায় সত্তর বছরের ওপর হয়ে গেল এর নতুন নাম।"
"আমি বলে রাখছি আজম, পাঁচশো বছর পরে ফিরে এলেও তুমি দেখবে এই শহরের নাম ঢাকাই থেকেছে। কাগজে-কলমে নাম বদলালেও লোকের মন থেকে এ নাম বদলাতে পারবে না মুঘলরা। মুঘলদের এ কোন্ পালা শুরু হয়েছে বলো? শুধু শহরের পর শহরের নাম বদলানো। বাদশাহ হুমায়ুন গৌড়ে গেল। নাম বদলে রাখলো জান্নাতাবাদ। ইসলাম খান চট্টগ্রামে গেল। ধর্মপালের সময় থেকে আরবদের দেয়া নাম সামানদার পছন্দ হলোনা। নাম রাখলো ইসলামপুর। সুজা এলো রাজমহলে। নাম রাখলো আকবর নগর। মীর জুমলা জয় করলো কুচবিহার। নতুন নাম হলো আলমগীর নগর। মালদা হলো আকবরপুর। এরকম ভাবে চলতে থাকলে কাল হয়তো বাংলাদেশের নতুন পরিচয় হবে। এমনিতেই তোমরা বাংলাকে ভাবছো হিন্দুস্তান। ক'দিন পর হয় আমার ভাষাকে কেড়ে নিয়ে বলবে ফার্সি বুলি ছাড়তে। অসম্ভব কিছু নয় আজম মুঘল বাদশাহদের কাছে।"
"শুধু সম্রাট জাহাঙ্গীরকে তুষ্ট করার জন্য নয়, আমি শুনেছি নাম বদলানোর অন্য কারণও ছিলো।"
শাহজাদা মুঘলদের দিকটা তুলে ধরার চেষ্টা করে।
"ঢাকা নামটি নাকি মুসলমানদের মনে ধরছিলো না। ঈশ্বরী দেবীকে এই শহরের ধুলামাটিতে ঢাকা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলো বলেই নাকি এই শহরের নাম হয়েছিলো ঢাকা শহর। সেজন্যই ঢাকা নাম শুনলেই মুসলমানদের মনে দেবীর কথা মনে পড়ে যায়। পৌত্তলিকতার স্পৃহা বাড়ে।"
"পড়ুক না। নাম মনে পড়লেই কি আমাদের মুসলমানদের বিশ্বাসটা পাল্টে যাবে? আমাদের বিশ্বাস কি এতোই ভঙ্গুর? জন্মে যে নাম দেখেছি, যে রূপ চিনেছি তাই নিয়ে বড় হয়ে উঠতে হবে না? প্রগতি শহরের নাম বদলে হয় না। প্রগতি আসে জীবনের আসল রূপ প্রতিফলনে।"
কথা বলতে বলতে ওরা বুড়িগঙ্গার তীরে আসে। এবারে ফেরার পালা। ভাগ্য ভালো। মাঝি অপেক্ষা করছিলো। শাহজাদা তাকিয়ে দেখে বড় কাটরার সরাইখানার ওপর আলো নেভেনি। এখনো খোলা। ছোট কাটরার প্রাসাদের সব আলো নিভে রয়েছে, শুধু একটি ছাড়া। ওপরের কক্ষে মৃদুভাবে আলো জ্বলছে। রাজকুমারী নাঙছেন গাভারু এখনো জেগেই রয়েছে। আশ্চর্য। ওর অপেক্ষার আকাশ কি কখনও ফুরোবে না?
অনেকবার প্রশ্ন করেছে শাহজাদা।

"কেন অপেক্ষা করো রহমত বানু? আমি যে প্রতি রাতেই তোমার কাছে আসবো সেটা আশা করা অন্যায় হবে বেগম। অন্য বেগমদের প্রতিও আমার দায়িত্ব রয়েছে। ইরান দুখত্ মনে মনে দুঃখ পায়, ঈর্ষা হয় ওর। ওদের ঠিকমতো দেখাশোনা করা শুধু আমার কর্তব্য নয়, আমার ধর্মীয় দায়িত্ব। সে দায়িত্ব থেকে আমি বিচ্যুত হতে চাইনি।"
"শাহজাদা ওর দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত হবেন সেটা আমি ঘুণাক্ষরেও আশা করি না।" নাঙছেন উত্তর দিয়েছে।
"তবে কেন অপেক্ষা করো? অন্য বেগমরা তো করে না। ওদের ঘুম ভাঙাতে হয়। অথচ তোমাকে অপেক্ষা করতে দেখলে আমার মনে গ্লানি আসে। আমি বিচলিত হই। সেজন্যই কখনো কখনো সটান তোমার ঘরে চলে আসি। আমি দায়িত্ব পালনে অপারগ নই।"
"কিন্তু শাহজাদা, আশা লালন করতে ক্ষতি কী? আশা রাখতে বাধা থাকবে কেন? অপেক্ষা করে যদি আমি আনন্দ পাই, আপনি কি সেটা পেতে নিষেধ করবেন?"
"না রহমত বানু। তোমার সুখ আমার কাম্য। কিন্তু প্রতিরাতে তোমার জেগে থাকা আমাকে দুর্বল করে, আমি অসহায় হই। তোমার মুগ্ধ ডাকে তোমার কাছে ছুটে আসি।"
"আমি ছলাহী হতে চাইনা শাহজাদা। আপনি আমার ঘরে আসবেন, শুধু সে আশায় আমি রাত জেগে অপেক্ষা করি না। আমি অপেক্ষা করি আমার নিজের স্বার্থে, নিশ্চিত হতে যে আপনি মহলে শয্যায় যেতে পারছেন কিনা। প্রায় রাতে আপনি অচেনা পথিকের মতো এই শহরে পায়চারি দিয়ে বেড়ান। রাতের বেলায় এই শহর মোটেই নিরাপদ নয়। কেউ চিনতে পারলে আপনি বিপদে পড়তে পারেন শাহজাদা।"
"আমার সাথে প্রহরী থাকে। সতর্ক সহচর থাকে। তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো রহমত বানু।"
"কিন্তু শাহজাদা, বিপদ শুধু একবারই আসে। আপনাকে বিদেশি দেখে কোনো খাংমরা পাগল হয়তো ছুরি নিয়ে তেড়ে আসতে পারে। সেজন্যই আমি নিশ্চিত হতে চাই যে আপনি প্রাসাদে ফিরেছেন কিনা। আপনি বাতিপুরা ভোরে ঘরে ফিরলেই আমি ঘুমিয়ে পড়ি।"

নৌকো থেকে ওরা নামে। জাফর ফিরে তাকায়।
"তুমি কি এখন সরাইখানার দিকে ফিরে যাবে আজম? মনে হচ্ছে কেউ ওখানে জেগে নেই। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।"
"তোমাকেও ঘুমোতে হবে। তুমি এগিয়ে যাও জাফর। আমি ফিরে যাচ্ছি সরাইখানায়।"
"এখনই যাবে আজম?" জাফর একটু ইতস্তত হয়ে প্রশ্ন করে।
"কেন অন্য কোনো নতুন রূপসীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে নাকি? ঢাকা শহরের ঢাকা রূপ ক্রমেই যেন আমার কাছে অবারিত হচ্ছে।" আজম শাহ্ মৃদু হাসে।
"হয়তোবা হবে সেটা। তুমিতো আমার জন্য রাতে খেতে পারলে না। সরাইখানা থেকে জোর করে তুলে আনলাম। নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত। কিছু মনে না করলে আমার সাথে খেতে পারো। চলো আমার বাড়িতে।" জাফর অনুরোধ করে।
ফিরে তাকায় শাহজাদা আজম শাহ্। নাঙছেন গাভারু এখনো অপেক্ষা করছে। করুক। এই মোহময়ী রাতে যে নাটক শুরু হয়েছে, তার শেষ দেখতে হবে। বলে।

"চল, তোমার ঘরেই যাই আজ।"
"বেশি দূরে নয়। ক্রোশখানেক হবে। চট করে পৌঁছে যাবো আমরা। মা এখনো অপেক্ষায় জেগে রয়েছে।"
চলতে-চলতে শাহজাদা আজম শাহ্ আবার কথা তোলে।
"রশমীর কথা তুমি বলতে-বলতে আর বললে না জাফর? আমার মনের মাঝে একটা কৌতূহল এখনো গেঁথে আছে।"
"তোমার মনের কৌতূহল তোমাকে পোড়াচ্ছে আজম। কিন্তু আমার মনে জমে রয়েছে বেদনা। সামান্য একটা সংস্কারের চাপে পড়ে রশমীর জীবনটা জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে গেলো। বৃথাই ওর রূপ, বৃথা ওর জীবন।"
"আমার ঔৎসুক্য তুমি ক্রমেই বাড়িয়ে তুলছো জাফর।"
"অথচ এই বাংলাদেশে রশমীর মতো মেয়ে একটা পাবে না। শত-শত পাবে। মিথ্যা সংস্কারের বাঁধনে পড়ে নিজের জীবনকে জলাঞ্জলি দিচ্ছে। আহুতি দিচ্ছে। কিন্তু কেন? সমাজ সংস্কার গড়েছে, মানুষ নিজের জীবনকে পরিপূর্ণ করার জন্য। জীবনকে অসুখী করার জন্য নয়। অথচ ও আজ মানুষের গড়া সংস্কারের কাছে ক্রীতদাস হয়ে আছে। মানুষ মাথা নত করেছে ভয়ে, বিষাদে সংস্কারের কাছে।"
"তোমার দর্শন ক্রমেই আমার কাছে অবোধ্য হয়ে উঠছে জাফর।" শাহজাদা অধৈর্য হয়ে ওঠে।
"রশমীর কথাতেই ফিরে আসছি। কুলীন পুরোহিত ব্রাহ্মণের মেয়ে সে। বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ। অর্থ আছে, সম্পদ আছে, বিদ্যাবুদ্ধি আছে। একমাত্র কন্যা তার, একমাত্র পুত্র। ওর ভবিষ্যৎ সুখের জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেনি ব্রাহ্মণ। নিজে বিদ্যা দিয়েছে। আচার্যকে রেখে শিক্ষা দিয়েছে। নাচে-গানে পারদর্শী করেছে। অবশেষে অন্য কুলীন ব্রাহ্মণের সাথে বিয়ের আয়োজনও করেছে। ধান দুর্বা দিয়ে সাজানো মণ্ডপ। অনিন্দ্য সুন্দর আল্পনা। মাঝে মাঝে মাছের ছবি। জানো বোধ হয় আজম, আমাদের বাঙালি সমাজে মাছ হচ্ছে কল্যাণ, লক্ষ্মী স্ত্রী, আর সুখের প্রতীক। বিয়ের তত্ত্বে হিন্দুরা দেয় সিঁদুর মাখানো জোড়া রুই, মুসলমানরা আনে আবীর মাখানো বড় রুই। আমার ঘরেও আজ মাছ পাবে আজম। মাছ ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। রুই, মাগুর, চিতল, কৈ, চিংড়ি নিয়ে আমরা বেঁচে আছি। জানো আজম, নদী-নালার মানুষ বলেই বোধ হয় আমাদের মাছের প্রতি এতো প্রীতি।"
"তোমাদের বাজারে গেলে সেটা বোঝা যায়। খাবারের মধ্যে পাবে হাজারো রকমের মাছ। ছোট বড় নানান মাপের। আর সব্জি, নিরামিষ। গোশ্ তো দেখাই যায় না।"
"গোশ্ত অবশ্যই পাবে বাজারে, তবে কম। আমরা মুসলমানরা হরিণ খাই, গরু খাই, ছাগল খাই। জঙ্গলে যারা থাকে তাদের অনেকেই নাকি সজারু, গো-সাপ পুড়িয়ে খায়। বুনো শুয়োরও ধরে। খিদে পেলে মেরে ফেলে। বেশি পরোয়া করে না।"
"কিন্তু হিন্দুদের মাঝে শুনি অনেকেইতো শুধু সব্জি খায়।"
"ব্রাহ্মণরা খায়। অন্য জাতরাও খায়, কিন্তু সব্জিও রয়েছে বাংলায় রকমারি। যদি কোনোদিন নিরামিষাষী ঘরে তুমি যাও, পাবে বড়ো করে ভাজা সর্ষের শাক, ঘি আর জিরে দেয়া পালং শাক। সর্ষের তেলে কড়া করে ভাজা মেথুরা শাক। এছাড়া পাবে হরেক রকমের সব্জি।

নিমবীজের তেতো ঝোল। বাগাড় দেয়া কুমড়ো, নটেশাক, কাঁঠালের বিচি, ঘিয়ে ভাজা ফুলবড়ি, করমচা। একবার মুখে দিলে আর স্বাদ ফেরাতে পারবে না।"
"তুমি খাবারের যে সব ফিরিস্তি দিচ্ছো তাতে মুখে পানি এখনই এসে যাচ্ছে আমার।" শাহজাদা হেসে বলে।
"ভেবো না, আমার মাকে বলবো। সে রেঁধে খাওয়াবে একদিন তোমাকে আজম।"
"কিন্তু মাছের কথায় তুমি আসল কথা হারিয়ে ফেলছো জাফর।"
"বার-বার কথার খেই হারাচ্ছি আমি। হয়তো সেই বেদনার কথা মনে আনতে চাই না বলেই।" জাফর স্বীকার করে।
"তোমার কষ্ট হলে বলো না জাফর। অন্য সময় শুনবো।"
"বিয়ের আসরে অপেক্ষায় রয়েছে রশমী। প্রহরের পর প্রহর যাচ্ছে। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। লগ্ন পেরিয়ে যাচ্ছে। বরের দেখা নেই। অনেক দূরের গাঁও থেকে আসছে। চিন্তা হলো পথে ডাকাত পড়লো না তো, লুটপাট হলো না তো? সবাই অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে। পুরোহিত মন্ত্র পড়ছে। রশমীর বাবা দেবতার সামনে প্রণত হয়ে আশীর্বাদ মানছে। অবশেষে কাজ হলো। জামাই এসেছে। সাড়া পড়ে গেলো চারদিকে– "তাড়া করো, তাড়া করো, লগ্ন পেরিয়ে যাওয়ার আগেই বিয়ের আয়োজন সম্পূর্ণ করো।" কিন্তু হবু জামাইয়ের দিকে তাকিয়ে রশমীর সখীরা হতবাক। হতবাক রশমী নিজেও। বয়স সত্তরের নিচে নয়, থুরথুরে বুড়ো, দাঁত নেই। ঠোঁট দিয়ে যেন লালা ঝরছে। চাহনি বিজড়িত। কথা জড়ানো। খবর হলো বুড়োর দুশো একান্নতম বিয়ে এটা। কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে সে। নিজে কুলীন ব্রাহ্মণ। সারা দেশে ছড়িয়ে আছে ওর বউ। রশমীর বাবা জাতে ওঠার জন্য এ বিয়ের আয়োজন করেছে।"

ধীরে মণ্ডপ থেকে উঠে দাঁড়ালো রশমী। ঠোঁট কামড়ে বলল, "এ বিয়েতে বসতে আমি অক্ষম।"
বৃদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণের কাছে রশমী তার উদ্ধত যৌবনকে সমর্পণ করতে পারবে না।
বাবা ক্ষেপে উঠলো। সমাজচ্যুত হতে পারবে না সে। আজ বিয়ে হতেই হবে। রশমী অনড়।
"অসম্ভব কথা। আমি সমাজচ্যুত হতে রাজি। কিন্তু জীবনের সুখ দিতে নয়। এ বুড়োকে বিয়ে করে জীবন কাটানোর চেয়ে মন্দিরের দেবদাসী হয়ে থাকা অনেক ভালো।"
"তবে তাই হোক।" আদেশ দিলো পূজারী পিতা।
বিয়ের রাত্রি সমর্পণের রাত্রি। হয় কন্যাকে সমর্পণ করতে হবে জামাতার কাছে, নয় দেবতার কাছে। কন্যার যদি ইচ্ছে তাই, তাহলে সে কন্যাকে সমর্পণ করছে দেবতার কাছে। শিব দেবতার কাছে। ফলে ব্রাহ্মণকে সমাজচ্যুত হতে হলো না। পিতা সমাজে রইলো কন্যাকে সমর্পণ করে।
"আজম, এটাই হলো রশমীর জীবনের আশ্চর্য ইতিহাস। বেদনার ইতিহাস।"
জাফর থমকে দাঁড়ায়।
"এটাই আমাদের বাড়ি আজম।"
শাহজাদা তাকিয়ে দেখে। চিনতে পারে। বেড়ার ছাউনি দেয়া এ বাড়ির দাওয়ায় বসেই

জাফর গান করেছিলো। ওদের পায়ের শব্দ শুনে একটি নারী প্রশ্ন করে,
"জাফর এসেছিস?"
"মা, আমার সাথে অতিথি আছে। তোমার কি জেগে না থাকলে হয় না মা? ঘুমোলেও পারো। জানইতো, আমার রাত হয় আসতে। এসে তোমায় ডেকে তুলতে পারি।"
ঘর থেকে বেরিয়ে আসে মা।
"মিথ্যা আমায় দোষী করছিস বাবা। জানিসতো, আমি জেগে থাকবো। তুই বাইরে ঘুরছিস, আর আমি থাকবো ঘরে ঘুমিয়ে। ভুলে যাচ্ছিস কেন, আমি কি তোর মা নই? আমার মনে কি সারাক্ষণ ছেলের জন্য উৎকণ্ঠা জেগে থাকবে না?"
কথাটা বলে সম্বিৎ পায় মা। মাথায় ঘোমটা টানে।
"আপনি ঘরে আসুন। আমি অযথাই কথা বলছি। সারাদিন একা-একা থাকি। জাফর এলে খালি কথা বলতে ইচ্ছে হয়।"
"মা, উনি তোমার কথা কিছুই বুঝছে না। ও বিদেশি। আমি বুঝিয়ে দিলেই ও বুঝবে।"
আজম শাহ্ বাড়ির ভেতরে ঢোকে। বেড়ার আঙ্গিনা পেরিয়ে অল্প কিছুটা হাঁটতে হয়। আলো-অন্ধকারে উঠোনটাকে ভাসা-ভাসা দেখা যাচ্ছে। ফুলের কেয়ারী দেয়া। সামনে কলাপাতা। বাংলাদেশের সব ঘরে-ঘরেই কলাগাছ আছে। আজম শাহ্ ভাবে, বাঙালিরা কলা খায়, আবার কলা দিয়ে ঘরও সাজায়। উঠোন থেকে অচেনা এক ফুলের সুগন্ধ নাকে এসে লাগছে।
"চমৎকার ফুলের ঘ্রাণ।" সে মন্তব্য করে।
"ওটা হচ্ছে হাসনাহেনা। রাতের রাণী। শুধু রাতেই ফোটে। দেখেছো তুমি?" জাফর এগিয়ে এসে একটা ফুল ছিঁড়ে তুলে ধরে। "আমার মায়ের ভারি বাগানের সখ। ফুল ছিঁড়তে দেখলেই রেগে উঠবেন।"
"তবে ছিঁড়লে কেন?"
"তোমায় দেখাবো বলে।"
আজম শাহ্ ফুলটি হাতে নিয়ে গন্ধ শোঁকে। আশ্চর্য মিষ্টি। আতরের মুগ্ধ সুবাসকেও ছাড়িয়ে যায়।
"আমাদের মেয়েরা রাতে কালো চুলে এ ফুল গুঁজে প্রেমিকের কাছে যায়। কাছে বসে কলকলিয়ে হাসে। ফুলের ওপর ঠিকরে পড়া চাঁদের আলোকে তারা ওদের রূপের দমক উপেক্ষা করতে পারে না। শাহজাদা– বাংলার ফুলের রাণী এটা।"
শাহজাদা ভাবে রঙবেরঙের কতই না ফুল আছে প্রাসাদে। কিন্তু এই নিশীথে জাগা এই আশ্চর্য ফুলতো কখনো আসেনি। নাঙছেন গাভারুর রূপ কি এই ফুলে আরো মনোহর হয়ে উঠবে না?
"জাফর। তুই শুধু উঠোনে দাঁড়িয়ে কথা বলবি? খাবার দিয়েছি। কিছুইতো ঘরে নেই। লজ্জায় ফেলেছিস আমাকে। ওকে ডাক্।" মা ডাকে।
"মা। আমিতো অতিথি সাথে আনিনি। এনেছি বন্ধু। বন্ধু যদি আমার সাথে আমার একই খাবার না খেতে পারে তবে সে বন্ধু কেন? অন্য এক সময় মনমতো খাবার তুমি আজমকে খাইয়ে দিও।"

দরজা দিয়ে মাথা নিচু করে আজম শাহ্ ঢোকে। দাওয়ায় মাদুর বিছানো। তার ওপর লালসাদা চেক চেক নক্সার দস্তান। সবে ভাজ ভাংগা। বোঝা যায় সযত্নে রাখা দস্তান। শুধু অতিথির অজুহাতে আজ আলমারি থেকে বেরোল। চারপাশে মাটির মালসায় খাবার সাজানো। প্রদীপ জ্বলছে তিন চারটে। হাওয়ায় কাঁপছে তার মৃদু আলো।

"হাতটা ধুয়ে নে বাবা।"

মা একটি মাটির মালসায় ঘড়া থেকে পানি ঢেলে এগিয়ে দিলো।

"তুমি বিদেশি। তুমি কি আমাদের খাবার খেতে পারবে?"

জাফর হাসে।

"বাংলায় যখন এসেছো আজম, বাংলার খাবার খেতেই হবে। থাকবে এদেশে আর খাবে অন্য দেশের খাবার, সে হয় না। বরং ধীরে ধীরে আমাদের খাবার খেতে শেখো।"

"আমি চেষ্টা করছি। সরাইখানায় যখন যা রাঁধে, আমি খাই। মাছ খাই, গোশত খাই।"

"ওসব খাবার রাধা সুবেদারের সৈন্য সামন্তদের জন্য। ওখানে হাজার জনের পাত পড়ে রোজ। বড় কড়াইতে রান্না হয়। জাতবেজাতের লোক আসে সুবেদারের সাথে দেখা করতে। ওসব খাবার ওদের জন্য।" মা নাক শিঁটকিয়ে বলে, "ওসব খাবার খেলে পেটে অসুখ হয়। রক্তবমি হয়। কখনো ওসব খাবার খাবেনা।"

"তবে কোথায় খাবে আজম? শুধু ডাব আর হরেক রকমের ফলমূল খেয়ে পেট ভরাবে?" মায়ের কথা শুনে জাফর পাল্টা প্রশ্ন করে।

"ডাবের মতো ফল আর হয় না। আল্লাহর কি আশ্চর্য কুদরত। দুটো রুটিও রয়েছে, সরবতও রয়েছে। পেটও ভরে, তেষ্টাও মেটে। তুমি সত্যি বলেছ। দিনে আমি দুটো তিনটে ডাব খাই।" শাহজাদা জানায়।

"যা খাবার এখনই খেয়ে নাও। পরে আবার নাও পেতে পার।" জাফর মন্তব্য করে।

"ডাবের কি আলাদা সময় রয়েছে? আমের মতো? শুধু গরমকালে আসে? সারা বছর পাওয়া যায়না?" শাহজাদা জানতে চায়।

"থাকলেতো সারা বছর পাবে। কিন্তু যে হারে ডাব চালান হয়ে যাচ্ছে, আর কয়েক বছর বাদে গাঁও গেরামে না গেলে একটা ডাবও পাবে না। ঢাকা শহরে তো প্রশ্নই ওঠেনা। নৌকো ভর্তি হয়ে চলে যাচ্ছে দিল্লিতে। কথা রটেছে, বাদশাহ আওরঙ্গজেব নাকি ভীষণ পছন্দ করে ডাব। সাথে সাথে তার আমির ওমরাহও। ডাবের স্বাদ পাওয়ার পরে মুঘল বাদশাহ এখন আর মুখে পানি তোলে না। সব আল্লাহর নেয়ামত। কিন্তু ওমরাহ্রা শুনেছি তার দ্বিগুণ। ওরা ডাবও খাবে, ইরানি মদও গিলবে।"

"তাই নাকি?" মা শিউরে উঠে বলে, "আমরা যে শুনেছি বাদশাহ আওরঙ্গজেব ভীষণ ঈমানদার মানুষ। মদ মাংস কিছুই ছোন না। সারারাত নামাজ নিয়ে আছেন। আর অবসর সময় কোরান শরিফ নকল করেন। বড় নেকবান বাদশাহ তিনি। আল্লাহ্ তাঁর ভালো করবেন। আল্লাহ তাঁর বেগম ও ছেলেদের ভালো করবেন।"

পিতার প্রশস্তি শুনে মনে মনে খুশি হয় আজম শাহ্। এই সুদূর বাংলা মুলুকেও ওর বাবার গুণের খবর ছুটেছে। সেটা বড় চাট্টিখানি কথা নয়। সে সায় দিয়ে বলে, "বাদশাহ আওরঙ্গজেব জীবনে কখনো মদ ছোননি। অবশ্য তিনি গোশ্‌ত খান। গোশ্‌ত খেতেতো

কোন দোষ নেই। আমি জানি জাঁকজমক উনি মোটেই পছন্দ করেন না। প্রাসাদে থাকলেও খুব সাধারণ জীবনযাপন করেন উনি। ঐশ্বর্যকে ভোগ করার কোনো স্পৃহা তাঁর নেই। দিল্লির প্রাসাদে নল দিয়ে গরম পানি আসে। অথচ বাদশাহ দিল্লির সেই কনকনে শীতের মধ্যেও ঠাণ্ডা পানি দিয়েই গোসল করবেন।"

"তবে বাদশাহ অতো টাকা দিয়ে কী করেন? শুনি এক এক সুবা থেকে কাড়ি কাড়ি আশরফি দিল্লিতে যাচ্ছে।" মা জানতে চায়।

"সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার জন্য অনেক খরচ আছে। সৈন্যসামন্ত পুষতে হয়, সেনাপতি রাখতে হয়। যুদ্ধবিগ্রহ অহরহ চলছে। সময় অসময়ে রাজারা বিদ্রোহ করে বসে। তাদের দমন করতে হয়। এছাড়া আমিররা আছেই। রাজস্বের ওপর ওদেরও হক আছে। ওরাও ভাগ পায়।"

জাফর বলে, "বাদশাহ কৃপণ হলে কি হবে, উনি খরচ না করলেও বেশিরভাগ টাকা বোধহয় আমির-ওমরাই লুটে পুটে নেয়। দেখ না, সুবেদার শায়েস্তা খান। তাঁর আমলে রাজস্ব আদায় হতো দিনে দু'লাখ টাকা। তার এক লাখ টাকা নিজেই খরচ করতো এই ঢাকা শহরে। বাকি টাকাটা শুনেছি যেতো মুঘল কোষাগারে। কথায় বলে যেতো। কিন্তু সত্যি যেতো কিনা কে জানে?"

"অতো টাকা কিসে খরচ হতো বাবা?" মা জানতে চায়। "চাল ছিল তখনো ভীষণ সস্তা। টাকায় আট মণ। আর কড়ি ফেললেই পাওয়া যেতো সের সের সর্ষে তেল, খাঁটি গাওয়া ঘি। জেলেকে আধআনি দিলেই গামলা ভরা মাছ উঠোনে ফেলতো। এক আনিতে দুটো ছাগল পাওয়া যেতো।"

"ওটা হচ্ছে মা তোমার সংসারের হিসেব। সুবেদারের নয়। কত দামি দামি জিনিস ওদের কিনতে হয়। টাকা লাগে। দেশ বিদেশ থেকে জিনিস আসে। একবার বাদশাহি বাজারে যেও মা আমার সাথে। দেখবে বিদেশি বণিকরা কী সব জিনিস আনছে। সব বিক্রি হবে সুবেদারের কাছে। ওর সাঙ্গপাঙ্গদের কাছে। টাকাতো ওভাবেই ওড়ে। বাজারে যাবে। দেখবে রঙবেরঙের রান্নার মসলা এসেছে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা লাগে ওগুলো কিনতে। এছাড়া ওদের বাসনকোসন সব সোনার-রূপোর। এক বাসনেই হয়তো হাজার হাজার টাকা লেগে যাবে। ওদের বেগমদের দেখবে হীরা, মণি, পান্না দিয়ে শরীরটা সাজানো। মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে রাখা। মসলিনতো পাওনা তোমরা। দেখেছো কেমন ফিনফিনে। শরীর ঢাকে না। সেজন্য ওদের লজ্জা ঢাকতে হয় অলংকার পরে। গোছা গোছা অলংকার দিয়ে।"

"কি জানি বাবা, আমার হিসেবে মেলে না। মসলিনের দামই বা আমরা পাচ্ছি কোথায়?"

"সবচেয়ে ভালো মসলিন চলে যায় বাদশাহর দরবারে। বাদশাহ আর তার আমির ওমরাহদের জন্য, ওর বেগমদের জন্য।"

"অথচ সেজন্য দিনে আমাদের এক আনা পয়সাও জুটলো না।" মা খেদের সাথে বলে।

"কিছু মসলিন আজকাল বাজারে থাকে। আগে বাজার উজাড় করে সব পাঠানো হতো নূরজাহানের কাছে। সাজসজ্জায় খুবই সৌখিন ছিলেন তিনি।"

আজম শাহ্ মা-ছেলের কথার মাঝে চুপ থাকে। কী বলবে বুঝতে পারে না। ওদের কথার মাঝে অনেক খবর পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু নিজে কিছু বেফাঁস বলে ফেললে ছদ্মবেশ বেরিয়ে

পড়তে পারে।
"শুধু সুবেদারের জন্য নয়, মসলিন যাচ্ছে বিদেশেও। সবচেয়ে ভালো মালবুস খাজা যায় বাদশাহের কাছে। বাকিগুলি কিনে নিচ্ছে বিদেশি বণিকরা। তোমার হাতে বানানো মসলিন হয়তো পাবে তুমি বিলেতী রাণীর ঘরে। এখান থেকে দশ-বারো হাজার ক্রোশ দূরে। ভাবতে কেমন একটা রোমাঞ্চ লাগে না মা? হয়তো তোমার হাতে বানানো মসলিন, না, হয়তো কেন—নিশ্চয়ই তোমার হাতে বানানো মসলিন কোনো বিলেতী রাজকুমারীর শরীরকে রূপবতী করে তুলেছে। অথচ তুমি এখানে শীতের রাতে কনকনে হাওয়ায় কাঁপছো। একটা মোটা শাড়ি কেনার সামর্থ্য নেই তোমার।"
আজম শাহ্ কথায় অজুহাত পেয়ে মৌনতা ভাঙলো।
"তোমার মা মসলিন বয়ন করতেন?"
"সারাজীবন ধরে করেছেন।" ক্ষোভের সাথে বলে জাফর। "দক্ষ শিল্পী ছিলেন তিনি। সোনারগাঁ থেকে লোক আসত। জানোইতো বাংলার সবচেয়ে ভালো মসলিন সোনারগাঁয় তৈরি হতো। ভীষণ চাহিদা। মাকে নিয়ে গিয়ে ওরা সেখানে বানাবে আবির রওয়ান, বানাবে শবনম শিশির। এগুলির ভীষণ চাহিদা। হতো জঙ্গলখাস্বা, জঙ্গলবারী থেকে। তান্‌জোবে ধরাবে জামদানি। মা বলেছেন— না। এটা আমার স্বামীর ভিটে। আমার বাপদাদার ভিটে। এখানে বসে আমি আবির রওয়ান বয়ন করবো। তোমাদের পছন্দ হলে নিয়ে যাবে। এখানে বসেই আমি শবনমকে বানাবো। তোমরা ইচ্ছে করলে কিনবে। তাঁতখানার মুঘল দারোগা এসে ফরমায়েস করতো। তারপর থেকে ওরাই দাম চুকিয়ে নিয়ে যেতো। মাকে কষ্ট করতে হতো না।"
"শুনেছি মসলিন তৈরি করতে বেশ দক্ষতার পরিচয় দিতে হয়।" শাহজাদা জানতে চায়।
"শুধু দক্ষতা নয়। ওরা ছিলেন শিল্পী। বয়ন শিল্পী। দরকার হতো শিল্পীর মতো প্রখর চোখ। প্রচণ্ড একাগ্রতা। আর ধৈর্য। আমি আমার মাকে দেখতাম সকালে নামাজ পড়ে এসে তাঁতে বসে একমনে বয়ন করে যেতেন। চারপাশে কোনো খেয়াল থাকতো না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিন্তু দুপুর হলেই বয়ন বন্ধ করতেন। উনি ক্লান্ত হয়েছেন সেজন্য নয়। কেননা মসলিনের মান খারাপ হয়ে যাবে দুপুরের উষ্ণতায়। গরমের জন্য মসলিনের উৎকৃষ্টতা ক্ষুণ্ন হবে, এই ভয়ে। অথচ কি একাগ্র ছিলেন মা। চারপাশে কোনো খেয়াল থাকতো না। পাশ দিয়ে কেউটে সাপ চলে গেলেও বুঝতে পারতেন না।"
শুনে মা লজ্জা পায়। ধমক দেয়।
"তুই থামতো জাফর। মায়ের কথা নিয়ে বক্‌বক্। আপনিতো কিছুই খাচ্ছেন না। আপনাকে কি আরেকটু মাছের ঝোল দেবো?"
"মোওয়াল মাছের ঝোল। তোমার হাতে বড় ভালো রান্না হয় মা। দাও, আজমকে দাও।" জাফর গোগ্রাসে খেতে খেতে বলে। আজম মাথা নাড়ে। সত্যি মাছের সুরুয়ার চমৎকার ঘ্রাণ বেরোচ্ছে। সুরুয়া দিতে গিয়ে কিছুটা ছলকে পড়ে দস্তানায়। মা সন্ত্রস্ত হয়।
"আপনার কাপড়ে পড়লো নাতো?"
প্রশ্ন শুনে আজম আশ্চর্য হয়। সুরুয়া অনেক দূরে পড়েছে। তাকি উনি দেখতে পাননা?
"না, নষ্ট হয়নি মা। তুমি চিন্তা করোনা।" জাফর বলে, "আমার মা রাতে ভালো দেখতে

পায় না। ওর দৃষ্টিশক্তি কমে এসেছে। মসলিন যারা বানায় তাদের সবার দৃষ্টি কমে যায়, কেউ কেউ অন্ধও হয়ে যায়। জানতো যে কেউ মসলিন বানাতে পারেনা। বাদশাহর মসলিনের জন্য ষোল বছর বয়সের তরুণী বাছাই করা হয়। ওরা ষোল থেকে তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত মসলিন বানায়। এসময় ওদের দৃষ্টিকে এতো প্রখর রাখতে হয় যে, কেউ কেউ অন্ধ হয়ে যায়। ভাগ্য ভালো আমার মা অন্ধ হননি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন এক তাকে তাকিয়ে থাকতে হতো। কমপক্ষে একশো পঁচিশটা আলাদা যন্ত্রকে ওর ব্যবহার করতে হতো। তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ মসলিন।"

আজম শাহ্ মাথা নাড়ে। হ্যাঁ, সে দেখেছে। নাঙছেন গাভারুর অঙ্গে দেখেছে মসলিন, সেই আবরণ। সেই আবরণ নাঙছেন গাভারুকে কতোটা নিরাবরণা করতে পারল, সেটা ও জানে। ওরা খেতে থাকে। খেতে খেতে ফিক্ ফিক্ করে হাসছে জাফর। যেন একটা পুরনো কথা মনে পড়ে ভীষণ মজা পাচ্ছে।

"তোমরা মুঘলরা মাছকে নাকি বলো গরম খাবার। আমরা বলি উল্টো কথা। মাছ হচ্ছে ঠাণ্ডা। শীতের দিনে সেজন্য আমরা গোশ্‌ত খাই। শুধু ইলিশ ছাড়া। ওটা বড় গরম মাছ।"

"সত্যি বলছিস জাফর।" মা আমেনা জানতে চায়।

"ওকে কিন্তু একদিন সরষে ইলিশ খাইয়ে দিও। বুঝবে তখন বাংলাদেশের রান্না।"

"আগে থেকে বলিস। আমি রান্না করে রাখবো। আপনি খাবেন তো?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই খাবো।"

আজম শাহ্ সায় দেয়। মালসাটা এগিয়ে দেয়। পরম তৃপ্তির সাথে বলে, "আমাকে অল্প একটু ওই সবুজ খাবারটা দিন।"

"নিন। ওটা হচ্ছে পাট শাক্ ভাজা। ওটা খেলে চামড়ার জৌলুষ বাড়ে। গাওয়া ঘি দেবো? আরেকটু গরম ভাত?"

আজম শাহ্ ঘাড় নাড়ে।

"মা আমি ফর্দ দিয়ে দিচ্ছি এখুনি। তুমি আজমের জন্য কী রাঁধবে? কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ আর আদার রস দিয়ে রাঁধবে কৈ। সাথে থাকবে কাতলা মাছের ঝোল। পারলে মাগুর মাছও এনো।"

"থাক। তোকে এতো ফিরিস্তি দিতে হবে না। ব্যঞ্জন যা বানাবার আমিই বানাবো। তুই শুধু বলবি কবে অতিথিকে নিয়ে আসবি?"

"তবুও বলে রাখি, যদি তুমি ভুলে যাও। আরো থাকবে নারকেলের দুধ দিয়ে গলদা চিংড়ির মুড়ো। সরষের তেলে গরম গরম ভাজা খরসুন মাছ। আর মিষ্টির মধ্যে থাকবে নারকেল পুলি, সন্দেশ, পুলিপিঠা।"

"থাক্। আর বলতে হবে না। নিজে কতো পেটুক আমার জানা আছে। আমার এ ছেলে শুধু কথায় রাজা। দেখনা কতোটুকু খেয়েই উঠে যাচ্ছে।"

জাফর আঙুল চুষতে চুষতে বলে। "ফর্দটা আমার জন্য নয়, আজমের জন্য। ও খেতে পারে ভালো। মা আজ তেফলার বানিয়েছো? বুঝলে আজম, আমার মায়ের হাতে বানানো ঘন দুধে আম কাঁঠাল সবরি কলার তেফলার খেলে আর তুমি বাংলা থেকে নড়তে চাইবে না।"

আজম শাহ্ মাথা নাড়ে।

পাঁচ

জাফর অতিথিকে বিদায় দিয়ে ঘরে ফিরে আসে।
"হ্যারে, একটা সোনার বাসনের ওজন কতো হবে রে?" মা জানতে চায়।
জাফর উল্টো হাসে।
"কেন মা? তুমি কিনবে নাকি? তোমার কাছে অতো টাকা জমেছে নাকি?"
"আরে বলনা। তোকে প্রশ্ন করলেই উত্তর দিতে চাস না।" মা ধমক দেয়।
"খুব জোর বিশ তোলা।"
"বিশ তোলা! বিশ তোলা সোনায় থালা হয়ে যাবে? তবেতো মাত্র দুশো টাকা।" মা হাতে গুণতে গুণতে বলে।
"সোনার তোলা এখন আট টাকা। মাঝে-মাঝে হয়তো সাড়ে আট বা নয় টাকায় ওঠে। তবে শায়েস্তা খান দিনে এক লক্ষ টাকা দিয়ে কী করতো। দিনে কয়টা সোনার বাসন কিনতো?"
জাফর বুঝতে পারে মায়ের মাথায় এখন শায়েস্তা খানের ঐশ্বর্য্যের কথা ঘোরাফেরা করছে। সে বয়ন শিল্পী। দিনে আয় করে এক টাকার চার ভাগের এক ভাগ। মাত্র চার আনা। এক সিকি যার আয় তার পক্ষে দৈনিক লক্ষ টাকা আয়ের ব্যাপ্তি বোঝা দুষ্কর। তবুও মাকে খেপাতে ইচ্ছে হয় জাফরের।
"শুধু তাই নয় মা, গেলো সাত বছরে আটত্রিশ কোটি টাকা বাংলাদেশ থেকে জমিয়ে দিল্লিতে নিয়ে গেছে শায়েস্তা খান। বুঝতে পারছ মা? একশো লক্ষ টাকায় এক কোটি টাকা হয়। তেমনি আটত্রিশ কোটি টাকা। ওই টাকা একের পর এক সাজালে ঢাকা থেকে চাটিগাঁও পর্যন্ত রাস্তা বনে যাবে।"
"ওতে যে মণ মণ সোনা কিনতে পারবে জাফর। কী করবে সে অতো সোনা দিয়ে?" মা হতভম্ব হয়ে বলে।
"ওরা সোনার প্রাসাদ বানাবে। প্রাসাদের গম্বুজ সোনা দিয়ে মোড়াবে।" জাফর ধীরে ধীরে ওর শ্রমিক মাকে জানায়।
মা রাতের আকাশের দিকে তাকায়। নক্ষত্র তখনো জ্বলজ্বল করছে। সেই নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে ভাবে আমেনা বেগম। সোনার প্রাসাদে থাকার সুখ কি এই ছাউনির ঘরের চেয়েও মধুময়।

ছয়

ঘুমন্ত জাফরকে জোরে জোরে ধাক্কা দিয়ে তোলে আমেনা বেগম। সকাল থেকেই আজ অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করছে আমেনা বেগম। ফজরের নামাজের পর তন্দ্রা চোখে নেমে এসেছে। কাল রাতে ঘুম খুব দেরিতে এসেছে। মাঝরাতে জাফর পরদেশি অতিথি নিয়ে এলো। অতিথি খেলো, গেলো। কথা তুলেছিলো সুবেদারের ঐশ্বর্যের। ওর লক্ষ-লক্ষ টাকা। শত শত রাজসখী। কোটি কোটি টাকা দিল্লিতে পাচার হয়ে যাওয়া। তার সামান্য কণা যদি সেদিন আমেনা বেগমের কাছে থাকতো, তাহলে ওর মরদকে হয়তো হারাতে হতো না। মরদের কথা ভাবতে ভাবতে ঝিমিয়ে পড়েছে আমেনা বেগম। তন্দ্রা লেগে এসেছে।

বাইরের শোরগোলে সে তন্দ্রা ভাঙ্গলো। দেখে ঘরের সামনে রাস্তায় জটলা। বেশ লোকজন। এক বিদেশির কথা শুনছে ওরা। আপদমস্তক কালো পোষাকে ঢাকা। মাথায় কালো টুপি। ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলছে। সমবেত শ্রোতারা সে কথা মন দিয়ে শুনছে। বিদেশি অনর্গল কথা বলে চলেছে। আওয়াজ শুনে আমেনা বেগম দাওয়া ছেড়ে বেড়ার কাছে আসে। বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে বিদেশিকে লক্ষ্য করে। দেখেই চমকে ওঠে। ঐ বিদেশিকে ও চেনে। ওকে চিনতে আমেনা বেগমের কখনো ভুল হতে পারে না। বিদেশির মুখে কালো চাপ দাড়ি। বুক পর্যন্ত সে দাড়ি ঢলে পড়েছে। তবুও পনেরো বছরের ব্যবধানেও আমেনা বেগম ওকে ভুলতে পারে না।

ছুটে ঘরে ফিরে এসে ধাক্কা দিয়ে তোলে জাফরকে। বারবার বলে।

"ওঠ বাবা, ওঠ। এখুনি ওঠ।"

"এতো সকালে কিসের তাড়া লাগলো তোমার মা?" জাফর যেন একটু বিরক্ত হয়।

এমনি সচরাচর দেরি করে ঘুম ভাঙ্গে জাফরের। সকালে ওঠা ওর ধাতে নেই। ফজরের সালাতের জন্য চট করে উঠে নামাজ সেরে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। মা আগে চেঁচামেচি করতো। আজকাল হাল ছেড়ে দিয়েছে। যখন ইচ্ছে উঠে পড়ুক। এমনিতেই জাফর হচ্ছে রাতের পাখি। অনেক রাত পর্যন্ত পিদিম জ্বালিয়ে পড়বে। মা কতো অনুযোগ করেছে—তার নিজের মতো দৃষ্টিশক্তি কমে যাবে। পড়ার জন্য আল্লাহ আলাদা সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে, সূর্যের আলোতে। রাত হচ্ছে শুধু ভাবনার, ভক্তির। জাফর কেন অন্যথা করবে?

অথচ জাফর মানেনি। জীবনে সে কি নিয়মইবা মেনেছে? আমেনা বেগম ভাবে। জন্মেছে ছেলেটা যেন নিয়ম না মানার জন্যই। পাঁচ বছরে তাক্‌তী হলো। মেধা ছিলো জাফরের। মক্তবে যেতে না যেতেই চিনে ফেললো আরবি হরফ, শিখলো কেরাত। শুরু করলো আরবি কেতাব। ইমাম শামসুদ্দীন অবাক। এমন কৃতী ছেলে তার মক্তবে আগে কখনো আসেনি। বছর পেরোতে না পেরোতেই সালাতের দোয়া-দরুদ পড়া শেষ। মা বললো—শুধু দোয়া-দরুদ পড়লেই হবে না। হতে হবে আল-কুরআনে হাফিজ। মন দিয়ে জাফর তাও শিখলো। ন'বছর বয়সে সে কুরআনে ক্বারী ও হাফিজ হলো। দুটোই। গর্বে মায়ের বুক ফুলে উঠেছে।

সারা গাঁও উপচে পড়েছিলো আঙিনায়। এমন কেরামতির কথা অনেক কালই শোনা যায়নি। যে গর্ব মায়ের তার চেয়ে বেশি গর্ব ইমামের। নাম ডাক ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে।
কিন্তু শুধু আরবি শিখলেতো হবে না। ছেলেকে চৌকস করতে হলে জানতে হবে আরো দু'টি ভাষা। দিনকাল বদলে গেছে। ফার্সি ভাষার প্রচলন হয়েছে। মুঘলরা বাংলায় আসার সাথে-সাথে দরবারি ভাষা বাংলা বদলে হলো ফার্সি। ভালো কাজ পেতে হলে, কিংবা কাজির দরবারে আর্জি পেশ করতে হলে, ফার্সি জানতেই হবে। সেদিক দিয়ে আফগান সুলতান গিয়াসউদ্দিনের আমল অনেক ভালো ছিলো। আমেনা বেগম ভাবে। দরবারে তখন বাংলার প্রচলন। দুটো ভাষা শিখলেই তখন চলতো ছেলেদের। রাজা গণেশের ছেলে জাদু সুলতান মুহম্মদ জালালউদ্দীন নাম ধারণ করে বাংলা দখল করলো। সেও দরবারে বাংলার প্রচলন ব্যাহত করলো না। দাস সুলতানী আমলেও বাংলার প্রসার হয়েছে। কিন্তু পনেরশ' পঁচাত্তর সালে মুঘলরা সুলতান দাউদকে উপড়ে ঢাকায় এলো। দাউদের মাথা কেটে পাঠিয়ে দিলো সম্রাট আকবরের দরবারে। প্রায় একশো বছর আগে। সেই থেকে শুরু হলো ফার্সি। অতোগুলো ভাষা শেখা কোমলমতি ছেলেদের জন্য বোঝা হয়ে উঠেছে। অথচ জাফরের কাছে সে বোঝা যেন বোঝাই নয়। ষোল বছর পেরুতে না পেরুতেই সে সমান পারদর্শী হয়ে উঠলো আরবি, ফার্সি ও বাংলায়।
নিয়ম ভাঙ্গা যেন শুরু হলো সেই থেকে। কথাটা শুনে চমকে উঠেছিলো ইমাম শামসুদ্দীন।
"হুজুর আমার একটি জিনিস জানার ছিলো। কুরআন শরিফ রোজ পড়েছি, আওড়াচ্ছি অথচ এর অর্থ বুঝি না কেন?"
"আল-কুরআনুল করিম হচ্ছে আল্লাহর কালাম। আমরা সাধারণ মানুষ। তাঁর বান্দা মাত্র। ওনার ভাষায়, কথায়, কথা বলবি তুই?"
"তবে আল্লাহ শুধু কেন এমন ভাষায় কথা বলেন যেন তাঁর বান্দারা বুঝতে পারে না হুজুর?" জাফর পাল্টা প্রশ্ন করে।
"অমন গুনাহর কথা মুখে নিসনে।" সতর্ক করে দেয় ইমাম শামসুদ্দীন। "আল্লাহর গজব পড়বে তোর ওপরে। জিভ খসে পড়বে। বেয়াদবি করছিস। সেজন্য তোর বাপটা কোথায় হারিয়ে গেলো। কোনো খোঁজখবর নেই তোর বাপের।"
"কিন্তু আমার কথার উত্তর দিন হুজুর। কুরআন পড়ে ওর অর্থ যদি বুঝতে না পারি, তবে আমরা আল্লাহর আলোকে চিনবো কি করে? জানবো কি করে?" জাফর বিনীত থেকেই প্রশ্ন করে যায়।
"জানবে বুজুর্গদের কাছ থেকে। জানবে পীর ফকিরের কাছ থেকে। জানবে মৌলবি মুনশির কাছ থেকে। আমরা কেন রয়েছি? আমরা তোদের জানাবো, বোঝাবো। তোদের জ্ঞানের জন্য আমরাই খিদমতগার থাকবো।" আত্মপ্রসাদের হাসি ইমাম শামসুদ্দীনের।
"কিন্তু আপনাদের মাঝ দিয়ে আমাকে কেন জানতে হবে হুজুর? সরাসরি জানতে অসুবিধা কী? সংস্কৃত ভাষা পড়ার সাথে সাথেই অর্থ জেনে যাই। ফার্সি পড়লেই বুঝি। বাংলাতে তো কথা বলি। কিন্তু আরবি ভাষার অন্যথা হবে কেন? আরবি ভাষা শুধু মুখস্ত করতে হবে কেন? আরবি ভাষার অর্থ বুঝবো না কেন?"
"কারণ এ ভাষার ফজিলত আলাদা।" ইমাম তার অজ্ঞতা ঢাকতেই বলে, "শুধু জ্ঞানীদের

জন্য আরবি ভাষা রচিত। যারা জ্ঞানবান তারা শুধু আরবি ভাষাকে বুঝতে পারবে।"
"তবে অন্য একটি প্রশ্ন আছে হুজুর। আল্লাহ কেন আরব দেশের প্রতি এতো মেহেরবান? সেখানে আরবি ভাষায় সাধারণ লোকেও কথা বলে। কুরআনও পড়ে সেখানে আরবিতে। সেখানে বাচ্চাদের ফজিলতের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না হুজুর। ওরা কিভাবে এতো নেকবান হলো?"
শুনে ক্রোধে রুখে ওঠে ইমাম।
"কথাগুলি নিশ্চয়ই তোর মায়ের কাছ থেকে শিখেছিস। স্ত্রীলোকের বাংলা শেখার কুফল এটা। সেজন্যই তো খসম্‌টাকে ধরে রাখতে পারলো না। অল্পবয়সী মেয়েরা বাংলা শিখলেই ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন তোলে। মেয়েদের পড়াশোনা করালে ওদের চিন্তার চেহারা বদলে যায়। ওরা ধর্ম থেকে দূরে সরে যায়।"
"আমার মাকে দোষ দেবেন না। আমার মাকে এ-কথার মাঝে আনবেন না হুজুর। আমি নিজেই জানতে চেয়েছি। উত্তর না দিলে আমি আর আপনার মক্তবে থাকবো না।"
জাফর হুজুরের কথার তীব্র প্রতিবাদ করেছিলো। ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিলো মক্তব থেকে। আর ধরে রাখতে পারেনি জাফরকে মক্তব। অথচ নিজে নিজেই যেন সে শিখেছে সব। জাফর কোথায় যায় কার কাছে যায় কিছুই ঠিক নেই। কার-কার সাথে মেশে। নানারকমের বিদঘুটে কথা বলে। আমেনা বেগমের মনে শংকা সব সময়ই জমে রয়েছে।
সেই কবে কৈশোর পেরোতে না পেরোতেই ওর বাপকে ধরে নিয়ে গেলো আরাকানিরা। সাথে ছিলো বিদেশি পর্তুগিজ দস্যুগুলি। লালমুখো সাহেবগুলোর মাঝে নাকি দু'জাত। একজাত ভালো মানুষ, তারা ধর্মকর্ম নিয়ে থাকে। ওদের পয়গম্বর হলো যিশু। ওরা ধর্মের কথা প্রচার করে। ঢাকার কাছে তেজগাঁও গ্রামে ওরা একটি গির্জা বানিয়েছে। গম্বুজটা বাঁকানো। আর গম্বুজটার ওপরে আড়াআড়ি ভাবে ছিল ক্রুশ। ওদের ধর্মের নিশানা। ওরা নাকি ভালো মানুষ। কিন্তু ওদের সাথে-সাথে বুড়িগঙ্গায় বড় বড় বজরা ভাসিয়ে অন্য একদল প্রায়ই আসে। হৈ হুল্লোড় চিৎকার করে। বজরার উপরে খোলা আকাশের নিচে ওরা চিৎকার করে গান গায়, নাচে সবার সামনে। মেয়েদের হাত ধরে, কোমর ধরে, নানারকম বিশ্রী ইঙ্গিত করে। আবার খ্যাক্ খ্যাক্ করে হেসে সবার সামনে মেয়েদের কোমর জড়িয়ে চুমু খায়। লাজশরম কিছু নেই। গাঁয়ের লোকের শরম দেখলে আরো জোরে হো হো করে হাসে। বিশেষত মেয়েরা যখন শরমে ঘোমটা টানে।
নদীর পাড়ে তো যেতেই হয়। ভোরের দিকেই গাঁয়ের মেয়েরা নদীর দিকে যায় দলবেঁধে। ধোয়া-মোছা আছে। গোসল আছে। শরীরকে সাফ করার নানান রীতিনীতি আছে। সেসব করতে নদীতে যেতেই হবে।
নয়তো পানি কোথায় পাবে? আজকাল অনেকেই বাড়ির উঠোনে গর্ত করে কুপ বানাচ্ছে। ঘরেই পানির ব্যবস্থা থাকছে। কিন্তু খননে খরচ অনেক। কয়জন রায়তের সে ক্ষমতা আছে? ফলে বেশিরভাগ গাঁয়ের মেয়ে ভোরের প্রথম রেশ আকাশে ফোটার আগেই দলবেঁধে নদীতে যায়। গোসল করার জন্য। কথায়, কোলাহলে, হাসিতে, ভোরের স্নিগ্ধতাকে প্রসন্ন করে তোলে। প্রাকৃতিক কাজ সারে। ঘরে ফিরতে-ফিরতে সকালের সূর্য অনেকটা হেলে পড়ে। এ সময়টা মেয়েদের। পুরুষেরা তা জানে। ওরা তখন মাঠে যায় ক্ষেতখামারের কাজে।

ঘরের ছাউনি দেয়। বাঁশের ঝাড় কেটে এনে উঠোনে প্রাচীর তোলে। বাঁশ সরু সরু কেটে ছিক্কা দেয়। পাট টানে। চরকায় সুতো কাটে। সময় পেলে ফুলগাছ লাগায়। গেঁদা ফুলে উঠোন ভরে। আবার কেউ কেউ জেলে নৌকো নিয়ে যায় মাছ ধরতে। দূর দূরান্ত থেকে মাছ ধরে আনে। পুরুষদের একদম ফুরসত নেই সকালে। ওদের অবসর দুপুরের পরে। সে সময় নদীর পাড় থাকে পুরুষদের দখলে।

কিন্তু হতচ্ছাড়া বিদেশিগুলি আসে ভোরের দিকে। স্নানরতা মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বেহায়ার মতো হাসে। সুযোগ পেলে জোর করে নৌকোয় তুলে চম্পট দেয়। অসহায় মেয়েদের মর্মভেদী কান্না ভোরের প্রসন্নতাকে খান খান করে ভেঙে দেয়।

ভাবতে আফসোস হয় আমেনার। পর্তুগিজরা এদেশে আসার সাথে-সাথে দিনকাল যেন ক্রমশই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মুঘলরা এলো আফগান সুলতানদের সরিয়ে। মুসলমান এসে মুসলমানদের হটালো। শুধু তাই নয়। মুঘলরা বিদেশিদেরও সাথে করে নিয়ে এলো বাংলায়। বিদেশিরা চুটিয়ে বাংলায় বাণিজ্য করছে। শুনেছে আমেনা বেগম। সেজন্য বাংলার সুবেদারকে নাকি ওদের কর দিতে হয় না। অথচ রায়তের পিঠ ভেঙ্গে-ভেঙ্গে সুবেদারের নামে জায়গিরদাররা খাজনা আদায় করছে।

বিদেশি বণিকরা মাঝে মাঝে সুবেদারকে তাদের বাণিজ্যের মুনাফার ভাগ দেয়। সেই মুনাফা দেয়ার জন্য ভীষণ প্রতিযোগিতা চলেছে বণিকদের মাঝে। সুবেদারকে খুশি করতে পারলে ষোলআনা লাভ। তখন সুবেদারের নাম ভাঙ্গিয়ে ওরাও গরিব চাষী রায়তদের ওপর অত্যাচার করতে পারবে। নির্ধারিত শুল্কের অনেক বেশি খাজনা আয় করতে পারবে। বেশ কয়েকটি গাঁয়ে বিদেশি বণিক সুবেদারের ফরমান নিয়ে কুঠি বানিয়েছে। সে সব গাঁয়ে এই বিদেশি বণিকরাই রাজা। ফিরিঙ্গিবাজারে নাকি ওদের নিয়ম-কানুন চলছে। সেখানে রায়তদের জোর করে ওদের গির্জায় নিয়ে গিয়ে ধর্মকথা শোনানো হচ্ছে।

মেয়েদের ওপর ভীষণ লোভ পর্তুগিজদের। গাঁয়ে-গাঁয়ে ঢুকে ঘরময় তছনছ করে খুঁজবে মেয়েদের। খুঁজবে সক্ষম পুরুষদের। পুরুষ ক'টাই বা আছে গাঁয়ে এখন। যখন তখন ওদের ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছে। ধরে নিয়ে গেছে সুবেদারের ফৌজ। যুদ্ধতো লেগেই আছে। ওতে অনেক সাহায্যের দরকার। পদাতিক সৈনিক না হলে কথা ছিলো। অনেক সম্মান তাতে। সুবেদারের লোক হিসেবে রসদ, কাপড়, চাই কি ঘর-বাড়িও মিলতো। কিছু লোকের ভাগ্যেই সেটা হতো। বাকি সবাই শুধু মজুর। সৈন্যরা হেঁটে যাবে গহন অরণ্যে। জনমনুষ্য কোনোদিন সে অরণ্য মাড়ায়নি। কাটো বন, কাটো গাছ। কাস্তে হাতে-হাতে লেগে গেলো হাজার হাজার রায়ত। বন কাটো, মাটি কাটো, রাস্তা বানাও। সুবেদারের অশ্বারোহী সিপাহি টগবগিয়ে ছুটে যাবে রাজ্য বিজয় করতে। সুবেদারের পদাতিক ফৌজ দামামা বাজিয়ে চলবে মুঘল শক্তির পতাকা ওড়াতে, রাজ্যের পর রাজ্য।

মুঘল সৈন্যদের সংখ্যা ঢাকায় কম নয়। প্রায় সাত মাইল জায়গা জুড়ে সেনাশিবির গড়ে উঠছে বুড়িগঙ্গার পাড়ে। তেজগাঁও থেকে টঙ্গী পর্যন্ত বিস্তৃত সেই ছাউনি। লোকে বলে এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার সৈন্য সেখানে নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। কুচকাওয়াজ করছে। ওদের সেবা যত্নের জন্য নিয়োজিত রয়েছে আরো কয়েক লক্ষ মজুর। এছাড়া রয়েছে শাহি নাওয়ারা। নদীর পাড়ে এলেই চোখে পড়বে শত শত শাহি নৌকা। কেউ বলে সাতশ'।

কেউ বলে হাজার। কেউ বলে পনেরশ’। নৌকা দাঁড়ে চলে। পালে চলে। আবার হাওয়া কমে এলে গুণ্ টানতে হয়। এক এক নৌকার জন্য চার থেকে ছয়জন সক্ষম পুরুষের দরকার। গুণ্ টানতে হবে, ছুটতে হবে, দৌড়াতে হবে, দর দর করে ঘাম বেরুবে। সেনাশিবিরে পুরুষদের ভীষণ চাহিদা। গাঁওগেরামে রয়েছে শুধু মাঝবয়সী পুরুষগুলো। অসুস্থ। কাশি আর জ্বরে জ্বরে ধুঁকে ধুঁকে থাকা পুরুষগুলো।
পর্তুগিজ বণিকগুলো শাহি নাওয়ারার চোখ এড়িয়ে হঠাৎ করে গাঁয়ে আসবে, আক্রমণ করবে, লুট করবে। মেয়ে পুরুষ যাকে সামনে পাবে ধরে ধরে নৌকায় তুলবে।
ভাবতেই দর দর করে চোখের পানি নেমে আসে আমেনা বেগমের। কেনই বা মরদটি আগের রাতে সেনা ছাউনি ছেড়ে তার সাথে দেখা করতে এসেছিলো। না এলে হয়তো আজ ফৌজদারের রায়ত হয়েই বেঁচে থাকতো। আমেনা বেগমের চোখের সামনে। আজ সে কোথায় ক্রীতদাস হয়ে আছে কে জানে? কোথায় বেচে দিয়েছে কে জানে? আছে বেঁচে কি? কোথায় কোন মুলুকে নিয়ে বিক্রি করে দিয়েছে, কতো দামে—আমেনা বেগম তাও জানে না। চেষ্টা তো কম করেনি আমেনা বেগম, তার মরদকে ফিরিয়ে আনতে পর্তুগিজ দস্যুদের কাছ থেকে। কিন্তু পারলো কই?
ঢাকার বাজারে মেয়েরা আজকাল পানির দামে বিকোচ্ছে। আলী মিয়ার ঘাটে বাজার বসে। অল্প বয়সী বাঁদিরা বিকোয় একশো টাকায় আর মাঝ বয়সী বাঁদি আশি টাকায়। পুরুষ এলে দাম ওঠে কিছু বেশি। দুশ’ থেকে আড়াইশ’। অথচ আমেনা বেগম ওর মরদকে বাঁচাবার জন্য তিনগুণ টাকা দিতে চেয়েছিলো জলদস্যুদের। তবুও এই পাষণ্ড দস্যুদের মন গলাতে পারেনি। ওর মরদের সক্ষম দেহটাই যে ওর কাল হলো। সেটা মনে হতেই চোখের পানি ঝরঝর করে বেরিয়ে আসে।
কেন সেই রাতে আসতে গেলো মরদটা। কেমন করে যেন খবর পেয়েছিলো বেশ কয়েকদিন ধরে জাফরের শরীরটা ভালো না। রাতে গা ওর গরম হয়। ভীষণ কাঁপুনি আসে। বেখেয়ালি হয়ে পড়ে। আবোল-তাবোল বকতে থাকে। কাঁথার পর কাঁথা জড়িয়েও শরীরের কাঁপন থামানো যায় না। সকালে তাপ কমে, অথচ দুর্বলতা যায় না। সারাদিন রোদে পিঠ দিয়ে বসে থাকতে খুব আরাম পায়। কিন্তু রাতে আবারো জ্বর আসে। ভুগতে ভুগতে দুর্বল হয়ে গেছে ছেলেটা।
খবর পেয়েই সেনাছাউনি থেকে মরদ এসে হাজির ছেলেকে দেখতে। পথ তো কম নয়। ধাঁপার কাছে পাগলাপুল পেরিয়ে, খিজিরপুর দুর্গের মাঝে। প্রায় পনেরো ক্রোশ হবে। আমেনা বেগম সবে তখন মসলিন বুনোনের যন্ত্রপাতি সরিয়ে রেখে রান্না করতে বসেছে। সময়টা খারাপ। মসলিনের চাহিদা বেড়েছে। বয়ন শিল্পীরা ব্যবসায়ীদের চাহিদা সামাল দিয়ে উঠতে পারছে না। তারা চাপ দিচ্ছে। আমেনা বেগমের ওপরও চাপ পড়ছে। আবীর রওয়ান চাই। শবনম চাই। এই দুটো মসলিন বুননে আমেনা বেগম পারদর্শী। ঠিক এমনি সময়েই জাফরের অসুখ হলো। গেল চাঁদে গিয়েছিলো মরদটা, ফিরে এলো আরেক চাঁদে। মনে মনে সুখী হলো আমেনা বেগম। তবুতো ছেলের খবর পেয়ে এলো। নয় মাঝে মাঝে দুই তিন চাঁদ পেরিয়ে যায়। বাড়ি আসতে হলে ক্রোশের পর ক্রোশ হাঁটতে হয় তার মরদকে।

আমেনা বেগম চুলোয় মাছ চড়ায়। সরু চালের ভাত চড়ায়। পানি গরম করে কালো পাতা সেদ্ধ করে। ঝুরঝুরে পাতা। মরদটা উর্দু বাজারের মুঘল ফৌজের শিবির থেকে এ পাতা নিয়ে এসেছে। পানিতে বেশ কিছুক্ষণ সেদ্ধ করার পর পাতার রস বেরিয়ে আসে। তারপর ঐ কালো পানিতে গুড় মেশাও। ঘন দুধের সর মেশাও। পরে চুমুক দিয়ে খাও। শরীর চাঙ্গা হয়ে উঠবে। রক্ত গরম হবে। মনটা খুশি হবে। ঝিমিয়ে থাকা মন যেন হঠাৎ অবারিত খুশির হল্কায় কেঁপে উঠবে। ভীষণ দাম এই পাতাগুলোর। আমেনা বেগম সেজন্য খুব যত্ন করে লুকিয়ে রাখে। শুধু ওর মরদ এলে বের করে।

ভোরের দিকেই জলদস্যুরা হনহনিয়ে এলো। প্রত্যেকের হাতে তলোয়ার, ছুরি আর বর্শা। আগুনের মতো গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। শুরু করলো লুটপাট। মরদটি তাড়াতাড়ি অসুস্থ জাফরকে পাশের ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রাখলো। আর ছোটখাট আমেনা বেগমকে মসলিন বানানোর একশ' পঁচিশ রকমের যন্ত্রপাতির মাঝে কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেললো। কিন্তু লুকিয়ে যদি রাখতো নিজেকেও ওর ঘরে সামনে স্তূপীকৃত কাসিদার আচ্ছাদনে। গেলো রাতেই নিয়ে এসেছিলো প্রতিবেশী বয়ন শিল্পীরা। বুটিদার কাসিদা, ঘন কালো। বয়ন করেছিল শিল্পীরা তুরস্কের সেনাদের পাগড়ির জন্য। কথা ছিলো ব্যবসায়ীরা এখান থেকেই কাসিদা তুলে নেবে। কাসিদার আড়ালে না লুকিয়ে মরদটা পালাতে গেলো উঁচু উঁচু বট গাছের ডালে। কিন্তু পারলো না। তার আগেই নামিয়ে আনলো মরদকে। টেনে তুললো বজরায়।

ভয়ংকর পর্তুগিজ জলদস্যুরা জোর করে নারী-পুরুষদের বজরায় তুলবে। তারপর আবার ওদের আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে মুক্তিপণ চাইবে। দিতে পারলেই ছাড়ান পাবে। আর না দিতে পারলে সারা জীবনের জন্য হারিয়ে যাবে। সুদূর বন্দরে-বন্দরে ক্রীতদাস হিসাবে চালান দেবে। বিক্রি হবে। আমেনা বেগম শুনেছে পাঁচ নদী পেরিয়ে বড়ো সমুদ্র। সেগুলো পেরিয়ে ওরা যায় সিংহলে, মালাক্কা দ্বীপে, সুমাত্রায়। ওর মরদকে হয়তো সুমাত্রায় নিয়ে গেছে বজ্জাতগুলো। লোকমুখে আমেনা বেগম শুনেছে সুমাত্রায় নারীরা নাকি দেখতে খুবই সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী, কোমল দেহ। সেজন্যই কি মরদটা পথ চিনে ফেরত আসতে চাইছে না, আমেনা বেগমের কাছে?

হার্মাদরা বজরা থেকে গাঁয়ে খবর পাঠালো, মুক্তিপণ ধার্য হয়েছে। মেয়েদের জন্য আড়াইশো তংকা, ছেলেদের জন্য পাঁচশো তংকা—সোনায়, রূপায়, তামায়। যে যেমনি পার নিয়ে এসো। সন্ধ্যা পর্যন্ত বজরা অপেক্ষা করবে। রাতে রওনা দেবে। সে সময়ের মাঝে যদি মুক্তিপণ দিতে পারো তবেই তোমাদের নারীদের, তোমাদের পুরুষদের, আমরা ফিরিয়ে দেবো।

রব উঠেছে ঘরে ঘরে, বর্বর, পাশবিক ন্যায়নীতিহীন জলদস্যু। বাজারে যেখানে একজন পুরুষ ক্রীতদাসের দর মাত্র এক-দেড়শ টাকা, মেয়েদের আশি নব্বই টাকা, সেখানে এতো টাকা মুক্তিপণ দাবি করে কী করে জলদস্যু পর্তুগিজ, আরাকানি মগ? তবুও আত্মীয়স্বজনরা যায়। যাদের সঙ্গতি আছে। অলংকার নিয়ে যায়। যাদের নেই তারা মাথায় হাত দিয়ে দাওয়ায় বসে কাঁদে। উচ্চস্বরে অভিশাপ দেয়। আমেনা বেগমও যেতে চেয়েছিলো ওর

সোনা রূপা আর আশরফি নিয়ে। সবগুলো মিলিয়ে দাম নিশ্চয়ই পাঁচশো তংকার উপর হবে। কিন্তু পাড়ার মুরুব্বিরা বাধা দিয়েছে। আমেনা বেগম গেলে ওকেও বজরায় তুলে ফেলতে পারে পর্তুগিজ দস্যুগুলো। যে রকম রূপসী মেয়ে সে। ওদের চোখে লোভ জ্বলজ্বল করে। মরদের মুক্তিপণ নিয়ে গেছে মক্তবের ইমাম শামসুদ্দীন। জাফরের শিক্ষক। তার স্বামীর বন্ধু। ফিরেও এসেছে খালি হাতে।

না পাঁচশ নয়, মুক্তিপণ ওরা আরো বেশি চায় আমেনার মরদের জন্য। সে সক্ষম, বলিষ্ঠ, কর্মনিষ্ঠ।

পাঁচশ টাকায় এ পুরুষ বিকিয়ে দিলে জলদস্যুদের ভীষণ ক্ষতি। মালাক্কায় গেলে হয়তো একশ সোনার আশরফি পাওয়া যাবে। হাজার টাকা পেলে তবেই ওরা ছেড়ে দেবে আমেনা বেগমের মরদকে। ক্ষোভে, আক্রোশে আমেনা বেগম বিলাপ করে কাঁদে। সাড়ে সাতশ টাকার মতো জোগাড় করতে পেরেছে। রাজি হয়নি জলদস্যুগুলো। রাতে নোঙর তুলে রওনা দিয়েছে ওর মরদকে নিয়ে।

অথচ মুক্তিপণের বিনিময়ে ফিরে এসেছে কতো পুরুষ। ক্ষীণকায়, দুর্বল, স্তিমিত। ওদের দিকে তাকিয়ে ক্ষোভ বেড়ে যায় আরো আমেনা বেগমের। কেন আল্লাহ ওর মরদকে বলিষ্ঠ করে তুলেছে। কেন বানিয়েছে শক্তিমান? ক্ষীণকায় হলে সে মরদতো আজও আমেনা বেগমের পাশে থাকতো। ফিরে আসতো জলদস্যুদের ঘৃণ্য হাত থেকে। শিখেছে আমেনা বেগম সংসারে দুর্বলরা নিরাপদ। সবলতার ওপর বাধা আসে। প্রবলকে মানুষ ভয় পায়। সমাজ ঝাঁপি দিয়ে রাখে। বাড়তে দেয়না। সুখ পেতে হলে, উন্নতি করতে হলে সংসারে মানুষের কণ্ঠস্বর নীচু করতে হয়। সবল মানুষের জন্য সুখ নেই। সমাজ ওদের সুখ দিতে জানে না।

এখন শুধু প্রতীক্ষা। শুধু নির্মম প্রত্যাশা। ওর হারিয়ে যাওয়া মরদের সাথে-সাথে সে ঝেড়ে ফেলেছে জীবনের যতো ক্লেশ।

অথচ জাফরটা ওর বাবার মতোই সবল হয়ে উঠেছে। কোন বাধা মানতে চায় না। তর্কের পর তর্ক তুলবে। বাছ বিচার নেই। যতোই বড় হচ্ছে ততোই যেন মুখের আগল খুলে যাচ্ছে। আবোল তাবোল বলেই চলেছে। সারাক্ষণ মনে শংকা আমেনা বেগমের। সারাটা সময় জটলা, আলোচনা, নানারকম তর্ক। ছেলেটা যে কী চায় বুঝে উঠতে পারে না আমেনা বেগম। কবিতা লিখছে। লিখুক না। হিন্দু জমিদার ডাকে। মুসলমান জায়গিরদাররা ওকে নিয়ে জলসা বসায়। ফৌজদারের দরবারেও জলসা হয়। ভাগ্য ভালো হলে সুবেদারের দরবারেও ডাক পড়তে পারে। খুশি হলে সোনার আশরফি মিলবে। সুবেদার শায়েস্তা খান মুশায়েরার আয়োজন করতো। কবিতা লেখকদের মাঝে প্রতিযোগিতা হতো। কবির লড়াই। যাদের ওপর সুবেদার খুশি হতো, তারা নাকি একশো, দু'শো, পাঁচশো হাজার পর্যন্ত সোনার আশরফি উপহার পেতো। আমেনা বেগমের মনে খুব খায়েশ—তার ছেলে জাফর সেও একদিন যাবে সুবেদারের দরবারে। সেলাম দিয়ে কবিতা পড়ে হাজার আশরফি নিয়ে ঘরে ফিরে আসবে। আমেনা বেগমের দুঃখের দিনের অবসান হবে। কিন্তু ছেলে কি সেটা গ্রাহ্য করে? দরবারের কথা শুনলেই নাক শিঁটকিয়ে বলে ফেলে।

"মা, আমি কবিতা লিখি মনের খুশিতে। সোনার আশরফিতে বিকোতে নয়।"

ছেলের এই বড় দোষ। খালি নাক উঁচু। কখনো কথা শোনে না। কথা শুনতে চায় না। এই যে আমেনা বেগম জোরে জোরে ধাক্কা দিচ্ছে, তাকে বলছে তার বাবাকে নিয়ে যাওয়া সেই ডাকাতটা এসেছে। তবুও ছেলে কি খোঁজ নিচ্ছে। একবারও মায়ের কথা শুনছে?

ঘুমের রেশ কেটে যেতেই জাফর ধড়ফড় করে উঠে পড়ে।

ভয়ার্ত কণ্ঠে মা বলে, "তোর বাবাকে যে শয়তানটা ধরে নিয়ে গিয়েছিলো, সে আবার এসেছে।"

"কী বলছ মা?" জাফর লাফ দিয়ে চৌকি থেকে নেমে পড়ে। "কোথায় সে?"

"ওই দেখ্, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।"

জাফর ঘর থেকে দাঁড়িয়ে মুখ উচু করে বাইরে তাকায়। কথা বলতে বলতে বিদেশি লোকটার মুখে ফেনা উঠেছে। তবুও অনর্গল কথা বলছে। জাফর চিনতে পারে। ওরা ধর্মযাজক। গাঁয়ে গাঁয়ে ওরা খ্রিষ্ট ধর্মের কথা বলে বেড়ায়। জাফর অবশ্য কোনোদিন শোনেনি। শুনতে ইচ্ছে হয়নি। থাকে সাহেবাবাদে। দস্যিয়াল নয়।

"মা ওরা ধর্মযাজক। জলদস্যু নয়। ভুল করছো তুমি? ওরা আসে ফিরিঙ্গিবাজার থেকে।"

"ওই ভুল আমার হতে পারে না জাফর। হাজার বছর পর ফিরে এলেও ওর চেহারা আমি ভুলবো না। চুল দাড়িতে সারা মুখ ঢেকে এলেও ওকে আমি ঠিকই চিনতে পারবো। আমি ওর চোখ দেখেছি। ওর চোখ আমি ভুলবো কী করে? তোর বাবাকে ওই বুড়ো বট গাছ থেকে টেনে নামিয়ে এনেছিল। তারপর ধরে নিয়ে গিয়েছিল।" মা উত্তেজনায় আর্তনাদ করে উঠে।

জাফর চট করে লুঙ্গিটা শক্ত করে কোমরে বাধে। গায়ে ফতুয়া জড়াতে গিয়েও রেখে দেয়। তাহলে দেরি হয়ে যাবে। কাঁধে গামছা জড়িয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে উঠোনে নেমে দাওয়া থেকে দাঁতের খিলান তুলে নেয়। খিলি করতে করতে বেরিয়ে আসে দরজা দিয়ে। শুনে ঠাহর করার চেষ্টা করে। বড় গজারি গাছের ছায়ায় গুঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে ধর্মযাজক বক্তৃতা করছে। অনর্গল বক্তৃতা করতে করতে তার মুখে ফেনা উঠে এসেছে। মুখচোখ লাল হয়ে গেছে তার।

সাত

জাফর লক্ষ করলো ধর্মযাজক হঠাৎ তার বক্তৃতায় ক্ষ্যান্ত দিয়ে গুঁড়ির ওপর বসে পড়েছে। সে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ওর কালো জোব্বার পকেট হাতড়ে চৌকোনা দুটো কাপড় বের করল। সাদা রঙের রুমাল। বেশ কিছুক্ষণ চোখে মুখে ঘষে ঘষে ঘাম মুছলো। পাশের বাক্স থেকে একটা তামার আধার বের করলো। ছিপি খুলে ঢকঢক গিললো। ঠোঁটে বিকৃতি এলো। হয়তো পানীয়টা তেতো। নিশ্চয়ই মাদক জাতীয় পানীয় হবে।

ধর্মযাজক আবার উঠে দাঁড়ালো। স্পষ্ট বাংলায় কথা বলছে সে। কিন্তু উচ্চারণে বিকৃতি রয়েছে। অথচ কথায় নয়। জাফর অবাক হলো। অনেক বিদেশি বাংলায় এসেছে। মুঘল আফগানসহ অন্যান্য দেশের বণিকরা। কিন্তু কারো মুখে সে কখনো বাংলা শোনেনি। হোক না সেটা বিকৃত উচ্চারণ। সবাই জগাখিচুড়ি ফার্সি বা উর্দু ভাষায় কথা বলে। প্রথমে বোঝা যায়না। কিন্তু পরে শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। প্রথম প্রথম জাফরের বুঝতে কষ্ট হতো। কিন্তু কিছুদিন ধরে নিয়মিত উর্দু বাজারে যাতায়াত করে পুরো ভাষাটা জাফরের এক্তিয়ারে চলে এসেছে। আরবি, ফার্সিতো জানতই। তার সাথে মিশেছে এই সৈন্যদের জগাখিচুড়ি ভাষা। সম্রাট শাহজাহানের আমলে নাকি এই উর্দু ভাষা চালু হয়েছে। নানান জাতের সৈন্য সামন্তের মাঝে কথোপকথনের জন্য। কিন্তু এ ভাষায় না আছে ঐশ্বর্য, না আছে তীক্ষ্ণতা, নেহাত সাদামাটা একটি ভাষা। ভয় হতো জাফরের। এই সহজ ভাষায় কথা চালু হলে বাংলার মানুষ যে হারিয়ে ফেলবে তার সংস্কৃতি, জীবন চেতনা।

ধর্মযাজক আবারো তার বক্তৃতা শুরু করে।

"আমার শ্রোতা ভাইগণ। আমি প্রথমেই ক্ষমা প্রার্থনা করে নিচ্ছি, মাঝখানে আমার বক্তৃতা বন্ধ করে দেয়ার জন্য। কারণ আমি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমি বিদেশি। বহুদূর থেকে এসেছি। বাংলার জলবায়ু আমার মোটেই সহ্য হচ্ছে না। সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আপনারা আমায় ক্ষমা করুন।"

জাফর উৎসুক হয়ে তার কথা শোনে। ধর্মযাজককে বেশ সজ্জন বলেই মনে হচ্ছে। বেশ বিনীত তার কথা। সে বলেছে অল্প কয়েকদিন হল বাংলায় এসেছে। অথচ মা বলছে এই ধর্মযাজকই হচ্ছে সেই জলদস্যু যে তার বাবাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। ক্রীতদাস বানিয়েছে। সৌম্য চেহারা, স্নিগ্ধ পুরুষ। জাফর নিশ্চিত হয়, মায়ের নিশ্চয়ই মতিভ্রম হয়েছে। এমনিতেই রাতে দেখতে পায় না। এখন হয়তো দিনেও দেখতে অসুবিধে হয়।

ধর্মযাজক এখনো বিরামহীন বক্তৃতা করে চলেছে।

"আপনাদের মাঝে নিশ্চয়ই এ প্রশ্ন জাগতে পারে যে, বাংলার জলবায়ু আমার না সইলেও কেন আমি পড়ে আছি এদেশে। তারপরও কেন আমি নিজ দেশে ফিরে যাইনি? আমি ফিরে যেতে পারিনি, কারণ ঈশ্বর আমার ওপর এক বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। ঈশ্বর তার পুত্র যিশুর বাণী আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য আমাকে মনোনীত করেছেন। সে কারণেই আমি আমার দেশে ফিরে যেতে পারছি না।"

শ্রোতাদের মাঝে কোরাস কণ্ঠে প্রশ্ন উঠে আসে।
"যিশু কে? কী তার বাণী?"
ধর্মযাজক শুনে খুশি হয়। মৃদু হাসে। স্মিতমুখে বলে।
"আপনাদের কৌতূহল দেখে আমি আনন্দিত হলাম। যিশু হচ্ছেন একজন প্রফেট। ঈশ্বরের দূত। মানুষের মঙ্গলের জন্য তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন।"
"ভগবানের দূত যুগে যুগে পৃথিবীতে এসেছে। তোমার যিশুও এসেছেন। এতে নতুন সত্যি আর কি হলো?" শ্রোতাদের মাঝে একজন বলে।
"অবশ্যই এসেছেন। যিশুর আগে প্রফেট মোজেস এসেছে। ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ। ঈশ্বরের বাণী উনি নিজে লিখেছেন তোরাহ গ্রন্থে। আমার বলতে বাধা নেই তার সে বাণী বহু বছর আগেই ভারতবর্ষে পৌঁছেছে। বাংলায় পৌঁছেছে। যে বেদ গ্রন্থ তোমরা হিন্দুরা পড়, সেটা স্বয়ং মোজেস রচনা করেছেন। সেই বেদ হচ্ছে মোজেসের তোরাহ গ্রন্থের রূপান্তর মাত্র। ভাষা শুধু বদলেছে।"
শুনে শ্রোতারা অবাক হয়। পিতা প্রপিতামহর কাল থেকেই ওরা জেনে এসেছে দেবদেবীদের কথা নিয়ে লেখা হয়েছে বেদ। সেখানে মোজেসের নাম কেউ উল্লেখ করেনি।
"অবশ্য মোজেসের নাম তোমরা নাও শুনতে পারো। কারণ বেদ রচয়িতা অন্য নামে পরিচিত ছিল ভারতে। তেমনি তোমাদের মনু দেবতা। প্রফেট নোয়া এসেছিলেন প্লাবন থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতে। তিনিও যিশুর পূর্বপুরুষ ছিলেন। বাংলার জনগণ তাঁকে মনু দেবতা বলেই জানে। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষরাও তাকে মনু দেবতা নামেই চেনে।"
"শুধু তাই নয়, আমরা তাকে নিয়মিত পূজা করে থাকি। নদীর ওপারে মন্দিরে গেলে মনু দেবতার মূর্তি পাবে তুমি।" শ্রোতাদের মাঝে অন্য একজন মন্তব্য করে।
"ভগবানের বাণী আমি সব সময় শুনতে চাই। কিন্তু আমার বলতে বাধা নেই হিন্দুদের মাঝে ব্যাপক ভাবে পৌত্তলিকতা ছড়িয়ে পড়েছে। নানা রকম দেবদেবীকে পূজা তারা করছে। এইসব দেবদেবীরা মানুষের মতোই চলাফেরা করে। দেবতা যদি মানুষের মতোই ব্যবহার করে, তবে তাকে দেবতা বলা কেন? ভগবানের বাণী এখনো হিন্দুদের মাঝে তেমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সে জন্যই ঈশ্বর আমাকে প্রেরণ করেছেন পবিত্র যিশুর বাণী তোমাদের মাঝে পৌঁছে দেয়ার জন্য।"
"শুধু হিন্দুদের মাঝে কেন?" আরেক শ্রোতা কটাক্ষ করে। "মুসলমানদের মাঝেও নয়? বৌদ্ধদের মাঝে নয়?"
ধর্মযাজক কটাক্ষটা ঠিক বুঝতে পারে না। সে বরং উৎসাহ পায়।
"সব ধর্মের মাঝেই ঈশ্বরের বাণী পৌঁছবে বলেই আমি বাংলায় এসেছি। ঈশ্বর নিজে তার পুত্রকে ধরাধামে পাঠিয়েছেন পাপী-তাপীদের সুপথে ফিরে আসার বাণী শোনাতে। ত্রাণকর্তা হিসাবে। ঈশ্বরের নির্দেশ পালন করার জন্যই তার পুত্র যিশু এই সংসারে এসেছেন আলোর পথ দেখাতে। তিনি রোগব্যাধি জয় করতে পারতেন। তিনি অন্ধকে দৃষ্টি দিতে পারতেন। তিনি পারতেন মৃতকে জীবন দিতে। ঈশ্বরের পুত্র বলেই তিনি অশেষ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ঈশ্বরের আরেক নাম হচ্ছে যিশু।"

জাফর এতোক্ষণ চুপচাপ শুনছিলো। এবারে তর্ক তুললো।
"বিদেশি ধর্মযাজক। আমার একটি প্রশ্ন ছিলো।"
"আমার নাম ফাদার ফার্নান্দেজ। আমাকে পিতা ফার্নান্দেজ বলে ডাকতে পার।"
"শোন বিদেশি। তোমাকে পিতা ডাকার ইচ্ছে আমার মোটেই নেই। তবে ধর্মযাজক ডাকতে পারি। বলতে পার এই ধরাধামের প্রথম পুরুষ, প্রথম নারী কে ছিলেন? ঈশ্বর কাকে প্রথম এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন? তোমাদের যিশুকে কি?"
"না না। তা হবে কেন।" ধর্মযাজক জিভ কাটে। "প্রথম মানব-মানবী হলো এডাম ও ঈভ। ঈভের ভুলে বেহশ্তচ্যুত হয়ে এডাম ধরাধামে এলেন। সে এক সুন্দর গল্প। তোমাদের বলবো কি?"
"না না সে কাহিনী আমরা জানি।" প্রায় একজোট হয়ে শ্রোতারা উত্তর দেয়।
"তোমাদের অন্য একটা ধর্মগ্রন্থ আছে ওর নাম লুক?" জাফর প্রশ্ন করে।
"আশ্চর্য। তুমি কি সেটা দেখতে চাও? তোমারতো ধর্মের ওপর বেশ জ্ঞান আছে, বিদ্যা আছে।"
জাফর সে প্রশংসা গায়ে না মেখে বলে যায়।
"সেই লুক গ্রন্থে বলেছে এডাম হচ্ছে ঈশ্বরের পুত্র। সেটা সত্যি নিশ্চয়ই? তাহলে কি আমরা ধরে নেবো, তারপর থেকে যতো পয়গম্বর এসেছে তারাও আদমের পুত্র? আদমের নাতিপুতি, পৌত্র, প্রপৌত্র? তাহলে তোমার মোজেস, তোমার নোয়া, আদমেরই বংশধর? সেটাই যদি আমরা জানি, তাহলে এতো বছর পরে ঈশ্বর কেন সবাইকে ডিঙিয়ে তার নিজের পুত্রকে আবার ধরাধামে পাঠালেন?"
জাফরের কথায় সমস্বরে হো হো করে হেসে ওঠে শ্রোতাবৃন্দ। ধর্মযাজক যেন কিছুটা অপমানিত বোধ করে। সে প্রশ্ন করে–
"তোমার নাম কি যুবক?"
"সৈয়দ জাফর।" এক শ্রোতা মন্তব্য করে। "ভীষণ সুন্দর কবিতা লেখে।"
"ও তুমি তবে মুসলমান। ভারতবর্ষে তোমরাই এখন সবচেয়ে বেশি অন্ধকারে রয়েছো। তোমাদের সবচেয়ে বেশি পরিত্রাণের প্রয়োজন। কারণ তোমরা যাকে পয়গম্বর বলে মানছো, তিনি মোটেই প্রফেট ছিলেন না। তিনি মোটেই ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন না। তিনি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী ছিলেন। সাদামাটা মাটির মানুষ।"
চাঞ্চল্য ওঠে জনতার মাঝে। কি কথা বলছে সে। তর্ক তোলে।
"উনি জন্মেছেন সাধারণ ঘরে। কিন্তু উনি আল্লাহর ঐশী বাণী পেয়েছিলেন। উনি ছিলেন আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ।"
"তোমাদের পয়গম্বর কোনো অলৌকিক দক্ষতার পরিচয় দেয়নি। ঈশ্বর চিরকাল তার ক্ষমতা দেখানোর জন্য তাঁর প্রেরিত পুরুষদের মাঝে আশ্চর্য ক্ষমতা দিয়েছেন। তোমাদের পয়গম্বর সেটা পাননি কেন?" হেসে প্রশ্ন করে ধর্মযাজক।
"আলবৎ পেরেছেন।" দৃঢ় কণ্ঠে বলে ওঠে একজন মুসলমান যুবক।
"আল্লাহ তাকে নিজে বেহেশ্‌তে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি সমাদৃত হয়েছিলেন। মৃত্যুর আগে কোনো মানব বেহেশ্‌তে যেতে পারেনি। অথচ আমাদের পয়গম্বর

গিয়েছিলেন। তিনি মানব হয়েও মৃত্যুর আগেই বেহেশ্‌তে গিয়েছিলেন।"
"তোমাদের কথাতেই আমার বক্তব্যের যথার্থতা প্রকাশ পেলো। তোমাদের প্রফেটের চরিত্রে যে সমস্ত অলৌকিকতা প্রকাশ করলে, সেগুলো সম্পূর্ণ বিশ্বাসের অযোগ্য। কেননা আজ পর্যন্ত কেউ তা হতে দেখেনি। কোনো মানব কখনো জীবদ্দশায় আকাশে উড়তে পারেনি। এসব তোমাদের মিথ্যা প্রচারণা। অন্যদিকে দেখো। আমাদের ঈশ্বরের পুত্র যিশুকে দেখো। তিনি অন্ধকে দৃষ্টি দিয়েছেন। এখনো দিচ্ছেন। পাপীকে পাপমুক্ত করেছেন। এখনো করছেন। আসলে তোমরা মুসলমানরা হলে ঘোর মিথ্যুক, প্রতারক।"
"মুখ সামলে কথা বলো ধর্মযাজক।" শ্রোতাদের মধ্যে কয়েকজন চিৎকার করে বলে উঠলো।
জাফর এতোক্ষণ চুপচাপ শুনছিলো। আর সহ্য করতে পারলো না। সেও ধর্মযাজককে উদ্দেশ্য করে উচ্চকণ্ঠে বললো।
"শোন ধর্মযাজক, ধর্ম নিয়ে তর্ক তোলা আমরা পছন্দ করি না। ধর্ম হচ্ছে একটা বিশ্বাস। সেটাকে হয় নির্বিচারে মানতে হবে। নয়তো জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে অন্বেষণ করে ধর্মের একটি পরীক্ষিত রূপে আসতে হবে। দুটোই আমি পরিপূর্ণভাবে চর্চা করিনি বলে তোমার সাথে ধর্ম নিয়ে তর্ক করার ইচ্ছে আমার নেই। তবুও তুমি কয়েকটি চিরন্তন বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছো। সেগুলো তর্ক করে তোমার ভুল ভাঙানোর চেষ্টা আমি করবো না। কিন্তু আমাদের যে সমস্ত বিশ্বাসকে তুমি আহত করার চেষ্টা করেছো, সেগুলোর প্রতিবাদ আমাকে করতেই হবে।"
ধর্মযাজক জাফরের দীর্ঘ কথায় অস্বস্তি বোধ করে।
জাফরকে উদ্দেশ্য করে সে বলে– "ভঙ্গিমা রেখে আসল বক্তব্যে আসো।"
"সেটাই আসছি। আমি কয়েকটা কথা তুলবো। সেগুলো তোমার যিশুকে ছোট করতে নয়। কারণ আমি মুসলমান। আমি ইসলামে বিশ্বাসী। অন্য কোনো ধর্মের বা তার পয়গম্বরকে হীন করে দেখার রীতি ইসলামে নেই। বরং হজরত ঈসা আমাদেরও পয়গম্বর। তোমার কথায় যুক্তি নেই সেটা আমি প্রমাণ করবো। আমার প্রথম প্রশ্ন সত্যি কি যিশু ঈশ্বরের সন্তান?"
"আমি আগেই বলেছি যিশু ঈশ্বরের সন্তান। তুমি কি শোননি?" ধর্মযাজক গর্ব করে বলে।
"যিশু কার গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন? কোন মানবীর গর্ভে?"
"বিবি মেরী তার মাতা ছিলেন।"
"উনি কি মানবী ছিলেন? উনি কি দেহের অধিকারী ছিলেন।"
"অবশ্যই মানবী। অবশ্যই উনি নারী।"
"অর্থাৎ তুমি বলতে চাচ্ছ, মানবীর গর্ভে জন্মেছেন তোমাদের পয়গম্বর যিশু।" জাফর নিশ্চিত হতে চায়।
"অবশ্যই। কিন্তু সে মিলন আমাদের সাধারণ অর্থে মিলন নয়।"
"না হোক। তুমি স্বীকার করেছো, তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের মেরী মাতার সাথে মিলিত হয়েছেন। যেভাবেই হোক না কেন। সেটা তোমার চোখে নিন্দনীয় হলো না। অথচ সনাতনী ধর্মের দেবদেবীরা নিজেদের মাঝে মিলিত হলে সেটা তোমার কাছে নিন্দনীয় হয়ে দাঁড়ালো।

এটা কোন ধরনের যুক্তি হলো?"
জাফরের যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে শ্রোতারা তাজ্জব হয়।
ধর্মযাজক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, "অন্য ধর্মকে রক্ষা করা তোমার দায়িত্ব নয় যুবক। তুমি তোমার ধর্ম সম্বন্ধে বলো।"
"আমার ধর্মে বলে হজরত ঈসা পবিত্রা নারী মরিয়মের গর্ভে জন্ম নিয়েছেন আল্লাহর ইচ্ছায় ও তার মহান মহিমায়। কিন্তু তিনিও আল্লাহর বান্দা। আমাদের মতো রক্ত মাংসের মানুষ। তিনি তার পুত্র নন। আল্লাহর কোনো সন্তান নেই। এবং কখনো হবে না।"
"তুমি প্রমাণ দাও কেন যিশু ঈশ্বরের পুত্র নন?" ফার্নান্দেজ যেন অনেকটা আদেশ করে বলে।
"আমার বিশ্বাসের সত্যতার প্রমাণ কেন আমি তোমার কাছে দেবো? আমি ইসলামে বিশ্বাসী। এটা শান্তির ধর্ম। ইসলামের শান্তির বাণীতে আমি নিজেই ওয়াকেবহাল। আমি জানি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়লে, রোজা রাখলে, সদা সত্য কথা বললে, আমি বেহেশ্‌তে যাবো। আমি তাই করার চেষ্টা করি। আমি সুখেই আছি। তোমার কাছে তোমার ধর্মকে রক্ষা করতে গিয়ে আমি আমার বিশ্বাসের ভিত্ কেন নড়াবো?"
হো হো করে হেসে ওঠে ধর্মযাজক।
"তোমার বক্তব্য নেই বলে, তুমি কথার ফুলঝুরি শোনাচ্ছো। তোমার মিথ্যা বিশ্বাসকে লালন করতে গিয়ে ঘোর পাপে নিমজ্জিত হচ্ছো।"
"আমার বিশ্বাস শক্ত হলে আমার গুনাহ হতে পারে না। আমার দায়িত্ব হচ্ছে আমার পয়গম্বরের বার্তায় বিশ্বাস রাখা। আমি তাই রাখছি। আমার কেন পাপ হবে?" জাফর উত্তেজিত কণ্ঠে বলে।
"আবার ফাঁকা কথা তুলছো। তোমরা যে নিষ্পাপ, তার প্রমাণ দাও।"
নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে কদর্য গালাগাল শুনে ধৈর্য হারিয়ে ফেললো সমবেত হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন শ্রোতারা। তারা সম্মিলিতভাবে মারতে উদ্যত হলো ফার্নান্দেজকে। ইট পাটকেল নিয়ে তেড়ে আসলো। ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলো ধর্মযাজকের ওপর। রুদ্র ভয়ংকর তাদের রণচণ্ডি মূর্তি। সরবে ঘেরাও করলো ধর্মযাজককে। কিন্তু জাফর ক্রুদ্ধ জনতাকে বাধা দিলো। ফার্নান্দেজকে পিছে রেখে সরাসরি জনতার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। হাত তুলে বাধা দিলো।
"ওকে মেরো না। ওকে আঘাত করো না।"
"কেন নয় জাফর? কেন নয়?" একসাথে চিৎকার করে উঠলো ক্রুদ্ধ জনতা।
"ও আমাদের ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত করেছে। আমাদের পূজনীয়দের নিন্দা করেছে। তুমি সরে যাও জাফর। আমরা ওকে দেখে নেবো।"
"ওর গায়ে হাত তুললে, ওকে মারলে আমরাই ছোট হয়ে যাবো। আমি চাইনে এই বিদেশির কাছে আমরা ছোট হই। হেয় হই।" জাফর সবাইকে শান্ত হওয়ার উপদেশ দেয়।
"না, ও ভণ্ড। মিথ্যুক। ও প্রতারক।" সমবেত শ্রোতারা একযোগে চিৎকার করে বলে ওঠে।
"বাংলাদেশ কখনো অন্য ধর্ম প্রচারে বাধা দেয়নি, নিষেধ করেনি। আবহমানকাল ধরে বাঙালি যে অধিকার দিয়ে এসেছে সকল ধর্মের সব অনুসারীদের, তোমরা সে অধিকার